বুলেটিন নং ১৮
বর্ষ ৭॥ সংখ্যা ২
প্রকাশ কাল: ২০ জুলাই ২০০১
...মূল্য: ৮৫ ॥ $2

স্বাধিকার
THE SWADHIKAR

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

...মগড়ে বহিরাগতদের হামলা লুটতরাজ: ৬টি পাহাড়ি গ্রাম ভষ্মিভূত

...স্বাধিকার রিপোর্টঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে ...শাসিত অপশক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ...একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ...পরিকল্পিতভাবে একের পর দাঙ্গা সংঘটিত করা ...যে কোন ঠুনকো অজুহাতে দাঙ্গা বাঁধিয়ে ...গ্রামে হামলা চালিয়ে পাহাড়িদেরকে গ্রাম ...উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা জমি জবরদখল ...নেয়াই হচ্ছে দাঙ্গাকারীদের আসল উদ্দেশ্য। ...সেনাবাহিনী ও উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠিই প্রধানত ...দায়িক ও জাতিগত দাঙ্গার উস্কানিদাতা।

...নালার মধ্য বোয়ালখালিতে ১৮মে পাহাড়ি গ্রামে ...র পর সর্বসাম্প্রতিক ২৫শে জুন খাগড়াছড়ির ...গড়ে দাঙ্গাও ঐ একই উদ্দেশ্যে সংগঠিত করা ...। রামগড়ে বহিরাগত বসতিস্থাপনকারীদের ...বের হামলায় অর্ধশতাধিক পাহাড়ি আহত ...ন, ৬টি গ্রামের ২২৭টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া ...। হামলাকারীরা ঘর পোড়ানোর আগে ব্যাপক ...লুটপাট চালায়। এই হামলায় কয়েক শত পাহাড়ি ...স্থায়ীভাবে গৃহহারা হয়ে যান। তিন শ' এর ...লোকজন সীমান্তের ওপারে আশ্রয়ের জন্য ...যান, কিন্তু ভারত সরকার তাদেরকে আবার ...পুরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

...গ্রামে হামলা চালানো হয় সেগুলো হলো ...পাড়া, গর্জনটিলা, জগন্নাথ পাড়া, ডেবার পাড়, ...টিলা, শ্মশান টিলা ও চৌধুরী পাড়া। এই ...গ্রামের ১১০টি বাড়িঘরের কয়েক লক্ষ টাকার ...মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

...পর তিনটি জাতীয় দৈনিকের তিন জন ...নিধি সরেজমিন তদন্ত করতে ঘটনাস্থল রামগড়ে ...। সেখানে তারা স্থানীয় লোকজন, ক্ষতিগ্রস্ত

২৫ জুন রামগড়ে বহিরাগতদের পুড়িয়ে দেয়া মারমা গ্রাম

পরিবার, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের সাথে আলাপ করেন। ঘটনার উৎপত্তি সম্পর্কে আজকের কাগজের প্রতিনিধি নজরুল কবীর লিখেছেন, গত সোমবার বাঙালি কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ 'সেটেলার বাঙালিদের' অধিকার আদায়ের জন্য দশ দফা দাবি সম্বলিত একটি প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। বেলা আনুমানিক সাড়ে দশটায় মিছিলটি রামগড় সদরের সিনেমা হল রোড অতিক্রম করার সময় একটি 'পটকা' ফুটে বলে স্থানীয় একটি সূত্র জানায়। সেই 'পটকার' শব্দ শোনার পর পরই এই সংগঠনের কর্মিরা মাস্টার পাড়ায় হামলা চালায়। প্রথম হামলার শিকার হয় আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যের বাড়ি। অপর একটি বাঙালি সূত্র দাবি করে, বাঙালিদের মিছিলে গুলি করা হয়েছে। কিন্তু সরেজমিনে এ ঘটনার সত্যতা মেলেনি।

আজকের কাগজের ঐ প্রতিনিধি ২৮ তারিখের সংখ্যায় আরও লিখেছেন, 'তিন জন বাঙালি ও একজন পুলিশের এস আই কে মেরে ফেলেছে পাহাড়িরা' এই গুজব ছড়ানো হয় মাইকে। স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে মাইকিং করে বাঙালিদের পাহাড়ি পাড়ায় আক্রমণের আহ্বান জানানো হয়। আজকের কাগজকে এ তথ্য জানালেন রামগড় দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুল মালেক। তিনি বলেন, আমরা পাহাড়িদের বাড়িতে আগুন না দেয়ার জন্যে বাঙালিদের হাতে পায়ে ধরি। কিন্তু তারা উল্টো আমাদের 'শান্তিবাহিনীর দালাল' বলে ধাওয়া করে। আমি দৌড়ে ফেনী নদীতে ঝাঁপ দেই। আরো অনেক পাহাড়ি পরিবার ফেনী নদীতে সাঁতরে ওই পাড়ে (ভারতে) গিয়ে আশ্রয় নেয়। তবে আমি ওই পাড়ে যাইনি। পাহাড়িরা ভয়ে কূল পাচ্ছে না, ওরা বাঙালিদের ঘরে আগুন দেবে কখন। এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা।

আজকের কাগজের প্রতিনিধি আরো লিখেছেন, স্থানীয় প্রশাসন, পাহাড়ি ও বাঙালিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন খাগড়াছড়ি বাঙালি কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা হেলাল ও রামগড় থানার নেতা ওয়ালিউল্লাহ। সূত্র জানায়, হেলাল বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আর ওয়ালিউল্লাহ এক সময় আওয়ামী লীগ করলেও বর্তমানে জাতীয় পার্টির সঙ্গে যুক্ত। পাহাড়িদের গ্রামে হামলার পর চুক্তি বিরোধী এই সংগঠনের পক্ষে থেকে বলা হচ্ছে, বাঙালি ট্রাক ড্রাইভার আক্তর আলী পাহাড়ি সন্ত্রাসিদের হাতে নিহত হওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ ডাকা হয়েছিলো। কিন্তু স্থানীয় সূত্র জানায়, বাঙালি কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের এই কর্মসূচীটি আরো আগেই ঘোষিত ছিলো। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে এ রকম বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেয়া হচ্ছে।

২৭ তারিখের জনকণ্ঠ পত্রিকায়ও একই কথা বলা হয়েছে। ঘটনাস্থল ঘুরে এসে জনকণ্ঠের প্রতিনিধি কামাল পারভেজ জানিয়েছেন, স্থানীয় নয়, বহিরাগত সন্ত্রাসীদের একেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে পাহাড়িদের ১৮৮টি ঘরবাড়ি। মঙ্গলবার ঘটনাস্থল রামগড় ঘুরে এ তথ্য মিলেছে। সেখানকার প্রায় সব সূত্রই বলেছে একই কথা। সোমবার ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনাটির নেপথ্য কারণ প্রথমে বাঙালী ট্রাক চালক হত্যার জের বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

ঘটনার সময় খাগড়াছড়ির ডিসি আশরাফুল মকবুল ও এসপি মোজাম্মেল হোসেন রামগড়ে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা ঘটনা প্রতিরোধে কোন ভূমিকা নেননি। অনেকের অভিযোগ ঘটনায় তাদের মৌন সম্মতি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পুলিশও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ১৫০ গজ দূরে ছিল বিডিআর -এর আউট পোষ্ট। তারাও বাঙালিদেরকে হামলা থেকে নিবৃত্ত করতে কোন কিছু করেনি। বরং যে সব পাহাড়ি আশ্রয়ের জন্য ক্যাম্পে যায় তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভোরের কাগজের প্রতিনিধি বিপ্লব রহমান ঘটনাস্থল ঘুরে এসে ২৮

৭ম পাতায় দেখুন

...ন্যাচরের তৈচাকমায় সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের নির্মম হত্যাকান্ড

...র রিপোর্ট ঃ নান্যাচর থানা থেকে মাত্র এক ...দূরে তৈচাকমা মুখ এলাকায় জেএসএস ...র দুই নাম্বারীরা আরো একটি নির্মম হত্যাকান্ড ...ছে।

...শে মে তৈচাকমা গ্রামের বাসিন্দা রমেল চাকমা ...হোটন (২০) পিতা বংশী কুমার চাকমা-র ...৬/৭ জনের একটি সশস্ত্র "দুই নাম্বারী" দল ...গ্রামের দুই ব্যক্তিকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক ...হরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতদের পরিচয় দোড্যা ...(২২) পিতা কুশল্যা চাকমা ও ধর্মমনি চাকমা ...পিতা গুরু কুমার চাকমা বলে জানা গেছে।

...মে সন্ধ্যার সময় অপহরণকারীরা জেএসএস-...কেন্দ্রীয় সদস্য শক্তিমান চাকমার বাড়ির পাশে ...(...ডি গ্রাম) কমল কৃষ্ণ চাকমার বাড়িতে গ্রামের ...মান্য ব্যক্তিদেরকে উপস্থিত থাকতে কঠোর ...নির্দেশ দেয়। এতে তৈচাকমা মুখ পাড়া ও গুকরছড়ি ...র প্রায় ১৮/২০ জন মুরুব্বী উপস্থিত হলে তাদের ...নে অপহৃত দোড্যা চাকমা ও ধর্মমণি চাকমাকে ...পায়ে বেঁধে আধমরা অবস্থায় হাজির করা হয়। ...হৃত দুই জনের করুণ অবস্থা দেখে আগত ...বীরা স্তব্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে যান। এমন সময় ...হরণকারীদের অন্যতম হোতা রামহরি পাড়ার ...ত্রাস উত্তম চাকমা (২৩) পিতা ধোপ্যা চাকমা ...র মুরুব্বীদের উদ্দেশ্যে রূঢ় কণ্ঠে বলে যে, ...ও ধর্মমনির লাশ তোমরা নেবে নাকি আমরা ...? এ কথা শুনে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ...মিনতি করে বলেন, "বাবু, ওরাতো এখনো ...। তাদেরকে এখনো বাঁচানো যাবে। আমরা ...দের কাছে এদের প্রাণ ভিক্ষা চাই। দয়া করে এদেরকে জীবিত মুক্তি দিন। তাদের পক্ষ হয়ে যে কোন শর্ত আমরা মাথা পেতে নেবো"। সন্ত্রাসী উত্তম আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, "এদের কোন ক্ষমা নেই। আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (জেএসএস) নির্দেশ তাদেরকে জবাই করা"। মুরুব্বীদেরকেও সে হুমকি দেয়। ফলে তাদের সকল অনুরোধ, অনুনয় বিনয় সন্ত্রাসীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা পৈশাচিক হিংস্রতায় মেতে ওঠে। মুরুব্বীদের সামনে অর্ধমৃত ধোড্যা ও ধর্মমনিকে তারা কিল ঘুষি লাথি মারতে থাকে। তাদের করুণ আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনেকেই চোখের জল সংবরণ করতে পারলেন না। অনেকে এই পৈশাচিক নারকীয় দৃশ্য না দেখার জন্য দুচোখ ঢেকে রাখলেন। আবার অনেকে সন্ত্রাসীদের হাতে পায়ে পড়ে ধোড্যা ও ধর্মমনির প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তবুও সন্ত্রাসীদের মন এতটুকু গলানো গেল না। এত নির্যাতনের পরও যখন দোড্যা ও ধর্মমনির

প্রাণবায়ু নিঃশেষ হচ্ছিল না, তখন সন্ত্রাসী রমেল তাদের লুঠিয়ে পড়া দেহে চেপে ওঠে বুকের উপর একের পর এক পাথর মারতে থাকে। আর পিশাচের মতো আঃ আঃ হোঃ হোঃ করে হাসতে থাকে। অবশেষে বন্ধ হলো ঘোড়ানির ক্ষীণ স্বর। নিভে গেলো দু'টি নিরীহ মানুষের জীবন প্রদীপ। নিথর নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকলো তাদের প্রাণহীন দেহ। কমল কৃষ্ণ চাকমার বাড়ির উঠোনে রক্তের ধারা বয়ে যেতে থাকলো।

সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া হিংস্র সন্ত্রাসীরা দোড্যা ও ধর্মমনির অসাড় নিস্প্রাণ দেহগুলো শেয়াল কুকুরের মতো টেনে হিচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এরপর সন্ত্রাসীরা মুরুব্বীদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ফরমান জারি করে:

১. লাশগুলো গুম করতে হবে। ২. ঘটনা সম্পর্কে আজীবন মুখ খোলা যাবে না। এমনকি দোড্যা ও ধর্মমনির পরিবারের সদস্যদের কাছেও খবর দেয়া যাবে না। ৩. থানা বা প্রশাসনের কাছে জানানো বা মামলা করা যাবে না। ৪. কোন সময় যদি খুনের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে দায়ি করা হবে। সে ক্ষেত্রে তাদের পরিণতি হবে আরো বেশী করুণ ও ভয়াবহ।

এই ফরমান জারির পর সন্ত্রাসীরা মুরুব্বীদের কাছ থেকে জোর করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। মুরুব্বীরা সন্ত্রাসীদের নির্দেশমত লাশ দু'টি গোপনে মাটি চাপা দিতে বাধ্য হয়।

কি ছিল দোড্যা ও ধর্মমনির অপরাধ? সন্তু লারমাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সমর্থন না দেয়াই কি তাদের অপরাধ? আর কেন সন্তু চক্রের এত বর্বরতা, এত হিংস্রতা? ভাইয়ের বুকে আঘাত হানতে কেন তারা এত হিংস্র হয়ে যায়? আর্মিদের সাথেতো তারা এত শক্তিমত্তা নিয়ে যুদ্ধ করতে পারেনি। শত্রুর কাছেতো এরা লুঠিয়ে পড়ে, আত্মসমর্পন করে, অস্ত্র ভান্ডার তুলে দেয়। এরা ভাইয়ের বুকে হানে আঘাত, আর শত্রুর সাথে করে কোলাকুলি। সন্তু চক্র সশস্ত্র লড়াই করেছেন বলে বড়াই করেন। কিন্তু একটু হিসেব করলে দেখা যাবে, তারা তাদের সেই সশস্ত্র যুদ্ধে যতজন আর্মি হত্যা করেছেন তার চাইতে অনেক

২য় পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় জুম্ম গ্রামে সেটলারদের হামলা: ৪০টি বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ

স্বাধিকার রিপোর্টঃ ১৮ মে দিঘীনালার মধ্য বোয়ালখালিতে বহিরাগতরা পাহাড়িদের ৪০টির মতো বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ ও ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। তাদের হামলায় ১৫ জন পাহাড়ি আহত হয়।

বহিরাগতরা ১৪ মে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত জনৈক সেটলার ভিডিপি সদস্য ওসমান গণি হত্যার প্রতিবাদে ঐদিন দিঘীনালায় সমাবেশে অংশগ্রহণ শেষে ট্রাক যোগে মেরুং ফিরছিল। এ সময় তারা পাহাড়ি বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। মধ্য বোয়ালখালি পৌঁছার সাথে সাথেই তারা সেখানে পাহাড়ীদের কয়েকটি গ্রামে হামলা চালায়। তারা শান্তি লক্ষীপুর গ্রামের ২৬টি ও কালাচান মহাজন পাড়ার ২০টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এছাড়া তারা শতাধিক বাড়িতে লুটপাট চালায় ও ভাঙচুর করে।

সেনা অপারেশনে জুম্ম নারীদের শ্লীলতাহানি ও গণ গ্রেফতার

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর হতে অপহৃত তিন বিদেশী প্রকৌশলীকে উদ্ধারের নামে ১৯ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে দোজর পাড়া, লারমা পাড়া, সাপমারা সহ আশেপাশের বিভিন্ন পাড়া গ্রামে হানা দেয়। এ সময় সেনারা গ্রামের নিরীহ লোকজনের ওপর হয়রানিমূলক অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেনারা ৭২ জনকে আটক করে এবং পরবর্তীতে ৩০ জনকে রেখে বাকীদের ছেড়ে দেয়। এ ৩০ জনকে থানায় নিয়ে গিয়ে ৬ দিনের রিমান্ডে এনে পুলিশ ও সেনা গোয়েন্দাদের দ্বারা নির্যাতন ও অহেতুক হয়রানি করা হয়।

এ অভিযানে সেনারা গণ গ্রেফতারের পাশাপাশি দুই জুম্ম কিশোরীকে ধর্ষণ ও আরো তিনজনের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। যৌন উৎপীড়ক সেনা সদস্যের একজনের নাম জানা গেছে। সেই সেনা সদস্য হচ্ছে সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরের ডাক্তার আশরাফ।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন ১১ মার্চ এক বিবৃতিতে রাঙ্গামাটির নান্যাচরে সেনা সদস্য কর্তৃক জুম্ম নারীদের শ্লীলতাহানি, ব্যাপক ধরপাকড়, নির্যাতন ও হয়রানির ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং সেনা সদস্যদের এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ তিন বিদেশী উদ্ধারের নামে সেনা সদস্য কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার নারীদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এবং ঘটনার হোতা সেনাসদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানান।

গ্রেফতারের ঘটনার পর গ্রেফতারকৃতদের স্ত্রী কন্যারা বেতছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ সময় সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছাড়াও পার্বত্য মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমা, বিভাগীয় কমিশনার, এসপিসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ প্রশমন করতে সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্য রেশন প্রদানের প্রস্তাব দিলে বিক্ষোভকারীরা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, "আমরা বিধবা নই, রেশন নিতে আসিনি। আমরা আমাদের লোকদের ফেরত নিতে এসেছি।" জানা গেছে, বিদেশীদের মুক্ত করতে আলোচনার প্রক্রিয়া চলতে থাকা অবস্থায় সেনাসদস্যরা উক্ত লোকজনদের ধরে নিয়ে আসে। এ ঘটনা বিভিন্ন মহলের সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং প্রশাসন এটাকে আর্মিদের হঠকারীতা বলে সমালোচনা করে। পরে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদ ও চাপাচাপির কারণে প্রশাসন বেতছড়িতে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের কৃত মামলাও তুলে নেয়া হয়।

জুম্ম গ্রামে সেনা হামলা, দুই ত্রিপুরা তরুণী ধর্ষণের শিকার

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ ২২শে মে মাটিরাঙ্গা থানাধীন দুর্গাবাড়ি ক্যাম্প থেকে এক দঙ্গল সেনা সদস্য বড়চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় হামলা চালায়। তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের মারধর ও দুই মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী ১২ জনের মতো একটি সেনা দল অস্ত্র তল্লাসীর নামে ঐ হামলা চালায়।

ধর্ষণের শিকার মহিলাদের একজনের বাবা বড়চন্দ্র ত্রিপুরা ঘটনা বর্ণনাকালে সাংবাদিকদের জানান, ২১ তারিখের গভীর রাতে (সোমবার) দুর্গাপুর ক্যাম্পের একদল উচ্ছৃঙ্খল সেনা জোয়ান অস্ত্র তল্লাসীর নাম করে তাদের গ্রামে যায়। সেনারা গ্রামের ১৩ ব্যক্তিকে সাংঘাতিকভাবে মারধর করে ও মহিলাদের ধর্ষণ করে। (ধর্ষিতাদের নাম গোপন রাখা হলো)। তারা জগচন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করে এবং পরে পুলিশের নিকট তুলে দেয়। তাকে খাগড়াছড়ি জেলে পাঠানো হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ২৪শে মে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। উক্ত দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অচিরেই ঘটনার তদন্ত করে দোষী সেনা সদস্যদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। ইউপিডিএফ -এর প্রধান প্রসিত খীসাও এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান ও দোষী সেনাসদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

এলাকা সংবাদ

সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের দ্বারা গ্রামবাসীদের বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ সাধারণ নিরীহ জনগণের ওপর সন্তু চক্রের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অত্যাচারের যেন শেষ নেই। দখলদার সেনাবাহিনীর মতো তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের পাড়াগ্রামে হামলা চালিয়ে লোকজনকে মারধর, হয়রানি ও জিজ্ঞাসাবাদ করছে আর লুটপাট চালানোর পর বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। শুধু

২৪ এপ্রিল লংগদুর বেগীছড়া গ্রামে সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের জ্বালিয়ে দেয়া ঘরবাড়ি।

তাই নয় আজ পর্যন্ত বহু নিরীহ গ্রামবাসীকেও তাদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। সোজা কথায়, আগে সেনাবাহিনীর সদস্যরা যা করতো এবং এখনো যা করছে, সন্তু চক্র বাহিনীও এখন তাই করছে।

গত ২৪ এপ্রিল ২০০১ সন্ধ্যের দিকে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা লংগদু ইউনিয়নের বেগীছড়া গ্রামে হামলা চালিয়ে সেখানে গ্রামবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। এর ফলে ছয়টি পরিবারের ৪,২২,০০০ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। জানা যায়, সন্তু গ্রুপের পদলা চাকমা পিতা সুরুং নাগা চাকমা এই অগ্নিসংযোগে নেতৃত্ব দেয়। তার বাড়ি হচ্ছে লংগদু থানার কাট্টলি বড়াদাম গ্রামে। যাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয় তারা হলেন, কমলাকান্ত চাকমা (৫০) পিতা মৃত হেডত্যা চাকমা, ভুবন জয় চাকমা (৩৫) পিতা কমলাকান্ত চাকমা, সুধাম চাকমা (৬০) পিতা মৃত পোত্যা রাম চাকমা, বিদ্যাধন চাকমা (২৬) পিতা কড়ধন চাকমা, কড়ধন চাকমা (৬৫) পিতা মৃত বৃক্ষ চাকমা ও জ্যোতির্ময় চাকমা (৫০) পিতা মৃত পোত্যা রাম চাকমা। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত এই পরিবারগুলো অন্যের বাড়িতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তাদের সহায় সম্পত্তি আগুনে পুড়ে যাওয়ায় তারা অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সন্তু চক্রের এ ধরনের অত্যাচারের ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে এখন চরম ক্ষোভ ও বিক্ষোভ বিরাজ করছে। যে কোন সময় তারা প্রতিবাদে ফুঁসে উঠতে পারেন। প্রতিরোধ করা না হলে এদের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নেই বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। কয়েক মাস আগে মহালছড়ির চিড়িনালায় সাধারণ জনগণ সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল। তারও আগে ভাইবোন ছড়ার শিবমন্দির এলাকায় প্রতিবাদী জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেওয়ান পাড়ায় সেনাবাহিনীর আশ্রয় প্রশ্রয়ে থাকা সন্তু বাহিনীর সন্ত্রাসীদের তাড়িয়ে দেয়। কৃষ্ণমাছড়া গ্রামের জনগণও এদের অত্যাচার ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সংঘটিত করেন।

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তি গুম

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ বাঘাইছড়ি ॥ গত ১লা মে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা কালি কুমার কার্বারী নামে এক ব্যক্তিকে গুম করেছে। এখনো পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে সন্তু চক্রের রূপকারী অঞ্চলের হোতা বাদিচান চাকমা ওরফে বাত্যা কালি কুমার চাকমাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এ খবর শোনার পর কালি কুমার কার্বারীর পরিবারের লোকজন ৩১শে মে ধর্মীয় বিধান মতে তার পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গোলাছড়ি সুবর্ণ বিহারে সংঘ দান সম্পন্ন করে দেন। শোকাভিভূত দায়ক দায়িকারা তার আত্মার সদগতি কামনা করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

কালি কুমার কার্বারী বাঘাইছড়ি থানাধীন মাচালং বাজারে দোকানদারী করতেন। এলাকায় তিনি মাস্টার নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ-এর একজন একনিষ্ঠ সমর্থন। জানা যায়, সন্ত্রাসীরা তাদের সাথে দেখা করার জন্য কালি কুমার কার্বারীকে একটি চিঠি দেয়। তিনি সে মোতাবেক সন্ত্রাসীদের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ১লা মে ভোরে খাওয়া দাওয়া ছাড়াই মাচালং বাজার থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে বোছড়ি নামক এলাকায় যোগাযোগ করতে যান। বোছড়ি সন্তু চক্রের একটি আস্তানা। সেখানে কালি কুমার কার্বারী সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী দয়া মোহনের সাথে দেখা করেন। সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর দয়া মোহন তাকে কৌশলে গভীর জঙ্গলে তাদের অন্য একটি আস্তানায় নিয়ে যায়। সে পর থেকে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এখন সন্ত্রাসীরা নিজেরাই বলে বেড়াচ্ছে যে তারাই তাকে গুম করেছে। কি উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে নিয়ে গুম করা হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। কালি কুমার কার্বারী রূপকারী মৌজার তক্তানালা গ্রামের কার্বারী বা গ্রাম প্রধান ছিলেন। তার গুম হওয়ার ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। লোকজন এখন বলাবলি করছেন এভাবে আর কতদিন সাধারণ নিরীহ লোকজনকে বিনাকারণে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের হাতে মরতে হবে। এর আগে ২২শে এপ্রিল ১৯৯৯ সন্ত্রাসীরা বালুখালি গ্রামের বীর লাল চাকমাকে (৪৫) খুন করেছিল। বাঘাইছড়িতে ডাকাতি মামলায় সাক্ষ্য দেয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে বারিবিন্দু ঘাটে তাকে খুন করা হয়। তিনি জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপের গণবিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করতেন। সে কারণেই তাকে খুন করা হয় বলে এলাকার সাধারণ জনগণের বিশ্বাস।

যারা কালি কুমার চাকমার গুম হওয়ার ঘটনার সাথে জড়িত তারা হলো সাবেক শান্তিবাহিনীর সদস্য মোহন চাকমা, রাজেশ চাকমা, দিলীপ চাকমা এবং পূর্ত লাল চাকমা।

কালি কুমার কার্বারীর গুম হওয়ার ঘটনার পর জনগণ সংগঠিত হয়ে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা তিলে তিলে অনুভব করছেন। তারা বলেন, সন্তু গ্রুপের লোকজনের কোন রাজনৈতিক কাজ নেই। লোকজনের প্রশ্ন, সন্তু গ্রুপ যদি সত্যিই জনগণের মঙ্গল চায়, তাহলে ইউপিডিএফ বার বার ঐক্যের প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও কেন তারা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ইউপিডিএফ-এর সাথে আলোচনায় বসছে না? সাধারণ জনগণের হিসাব অত্যন্ত পরিষ্কার : সারেন্ডারের পূর্বে তারা জেএসএস-কে ২৪ বছর যাবত সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছেন। অনেক নিপীড়ন নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু বিনিময়ে সন্তু চক্র তাদেরকে অশান্তি ও অরাজকতা উপহার দিচ্ছেন। অপরদিকে, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে সমর্থন দিয়ে অনেক উপকার হয়েছে বলে তাদের অভিমত। তারা আন্দোলনে অনেক ভূমিকা রেখেছেন। ছাত্র পরিষদের আসল নেতারা বর্তমানে ইউপিডিএফ গঠন করে দৃঢ়ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদেরকেই সমর্থন দিতে হবে বলে তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

নান্যাচরের তৈচাকমায় সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের নির্মম হত্যাকাণ্ড

১ম পাতার পর

বেশী স্বজাতির ভাইকে খুন করেছেন ... ও শক্তিমত্তা নিয়ে বাদি গ্রুপের বিরুদ্ধে ... টিপিবি ও সর্বহারাদের নির্মূল করেছেন ... তারা আর্মিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি ... আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তা নিয়ে প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে ... করলে জনগণের পরিণতি আজ এ রকম ... সন্তু লারমা কেবল গৃহযুদ্ধ বাধাতেই ... জনগণের ওপর মাতব্বরী ও খবরদারী ... সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে নতি ... পারঙ্গম। তিনি সেনাবাহিনীর নিকট অস্ত্র ... স্ব স্বজাতির বুকে অস্ত্র চালান। তিনি ... সাথে সমঝোতা করেন, আর নিজ ভাইয়ের ... যুদ্ধ করেন। তাকে বিশ্বাসঘাতক না বললে ... বলা যাবে?

কিন্তু এই নৃশংসতা ও বর্বরতারও শেষ ... নৃশংসতা ও পৈশাচিক বর্বরতা সন্তু চক্রের ... পতনেরই ইঙ্গিত। ইংরেজীতে একটি কথা ... Whom god wishes to destroy first ... him mad. অর্থাৎ ভগবান যাকে শেষ করতে ... আগে তাকে উন্মাদ বানান। সুতরাং সন্তু ... বর্তমানে অস্বাভাবিকভাবে পৈশাচিক উন্মাদনায় ... উঠেছে। তাদের এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে বলি ... নিরীহ জনগণ। কিন্তু এর শেষ আছেই। শত ... উৎপীড়ন চালিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও ... চেতনাকে ধ্বংস করা যাবে না। জনগণের ... লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ইউপিডিএফ ... কে কখনো নির্মূল করা যাবে না। জনগণের ... শক্তির কাছে যে কোন অপশক্তি পরাজিত হবে ... জনগণ ও ইউপিডিএফ ঐক্যবদ্ধভাবে ... পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। চোরের ... গৃহস্থের একদিন। এই একদিনই জেগে ... জনগণ। সেদিন তারা নিরীহ শান্ত সুবোধ ... মতো থাকবেন না। সেদিন তারা নীরবে ... অত্যাচার সহ্য করবেন না। সেদিন তারা ... মতো গর্জে উঠবেন। প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মতো ... আসবেন। যেভাবে লোগাং গণহত্যার ... রাজপথ প্রকম্পিত করেছেন। জুম্ম জনগণ ... সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। তাদেরকে নিয়ে খেলা করবেন ... সাবধান সন্তু চক্র, সাবধান গণশত্রুরা!!

সন্তু চক্রের হাতে এক নিরীহ ব্যক্তি অপহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ১৭ মে ২০০১ সন্তু ... মদদপুষ্ট পার্বত্য শান্তি পরিষদের সন্ত্রাসীরা ... চাকমা (৩২) নামে এক নিরীহ ব্যক্তিকে ... রূপবান পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে বন্দুকের ... মুখে অপহরণ করে। জানা যায়, সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ হিসেবে ৪০০০০ টাকা দাবি করে।

বরকলের প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র ... এক বিবৃতিতে এই ঘটনার জন্য সন্তু ... জেএসএস-কে দায়ি করেন। তিনি অবিলম্বে অপহৃত ... ব্যক্তির নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। তার এই বিবৃতি ... দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা তাকে ... হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে।

নানিয়াচরে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ১৫ এপ্রিল সন্তু গ্রুপের ... চক্র ইউপিডিএফ-এর সদস্য উজ্জ্বল চাকমা ... উকছড়ির তার শ্বশুরবাড়ীতে এ্যামবুশ করে ধরে নিয়ে ... যায়। তাকে বেদম মারধর করার পর ছেড়ে দেয়া ... হয় বলে জানা গেছে। তবে একইদিন সন্ত্রাসীরা ... ইউপিডিএফ-এর দুই কর্মির দুই নিকট আত্মীয় ... প্রত্যেকের কাছে থেকে ৫০,০০০ করে ১ লাখ টাকা ... চাঁদা দাবি করে।

উকছড়ির উক্ত ঘটনার পর সন্ত্রাসীরা বন্দুকভাঙ্গার ... দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে ছিমুখাছড়া প্রাইমারী ... স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণ মোহন চাকমাকে পানিতে চুবিয়ে ... মারধর করে ও বিভিন্ন হুমকি দেয়। তার অপরাধ ... তিনি ইউপিডিএফ কর্মি ভাস্কর কোথায় আছে ... বলতে পারেননি। সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া ... সন্ত্রাসীরা ভাঙামুরো থেকে ভাগ্য কুমার চাকমাকে ... অপহরণ করে। তার ওপর অমানুষিক শারীরিক ... নির্যাতন চালানো হলে তার একটি দাঁত ভেঙে যায় ... এরপর ২০ এপ্রিল সেনাবাহিনীর কাপ্তাই ... ইউপিডিএফ কর্মি খোঁজার নামে টিবিরাছড়া গ্রামে ... নেয়। সেখানেও তারা বিনা কারণে সাধারণ ... লোকজনকে গণহারে মারধর করে বলে জানা ...

আফগানিস্তানে বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল ও সমাবেশ

...স্থানে তালেবান মৌলবাদী তালেবানদের দ্বারা ...বৃহৎ বৌদ্ধ মূর্তিসহ সেদেশের সকল মূর্তি ...প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিন্দা ও ...পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ...এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। ...১২ মার্চ খাগড়াছড়িতে পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের ...একটি শান্তি মিছিল ও পরে সমাবেশ ...হয়। সমাবেশে বক্তারা বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের ...তালেবানদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ ...। বক্তারা এই ধ্বংসযজ্ঞকে মানব জাতির ...ও ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধন হিসাবে উল্লেখ ...এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ...সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশের ...জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে ...স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

...মার্চ বান্দরবানে একই দাবিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ...বিশাল মৌন মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের ...প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করার পর প্রেস ক্লাবের ...এসে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তারা ...তালেবানদের বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ...জানান। তারা সরকারকে এর বিরুদ্ধে ...ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। ...বক্তব্য রাখেন প্রভাত কুমার বড়ুয়া, ইউকে ...বিক্রম,উকোভাখো, ধর্মবোধি হবির, সুশীল ...চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া প্রমুখ।

জেএসএস-এর অত্যাচারে আরো ২টি পরিবার ঘরছাড়া

...বার্তা ॥ গত ২৩ মে পানছড়ি থেকে আরো ...টি পরিবার জেএসএস সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে ...হতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে এরা ...ছড়ি গিরিফুল এলাকায় বসবাস করছেন। এরা ...কৃষ্ণ বিহারী চাকমা, ৬০ ও প্রদীপ চাকমা ...পরিবার। দুই পরিবারই পানছড়ি থানা ...পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এর আগে সন্ত্রাসীরা ...এলাকা থেকে ৬টি পরিবারকে তাড়িয়ে দেয়।

ঢাকায় রাখাইন সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রতীক অনশন কর্মসূচী পালিত

...কার রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশের দক্ষিণে ...সাগরের তীরে পটুয়াখালী জেলার রাখাইন ...সত্তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে ...ইন সমাজ কল্যাণ সমিতি গত ৩১ মার্চ ঢাকায় ...প্রেসক্লাবের সামনে প্রতীক অনশন পালন করেছে।

...দের দাবি অনুযায়ী, প্রায় দুই শত বছরের ...রাখাইন জাতিসত্তার ইতিহাসে এই প্রথম ...ভাবে নিজেদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ...ঢাকায় কোন কর্মসূচী পালন করলেন।

...অনশন কর্মসূচীর মাধ্যমে রাখাইন জাতিসত্তার ...পুঞ্জিভূত বঞ্চনা, ক্ষোভ, বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ...। সমিতির সদস্যদের সাথে আলাপ করে জানা ...পটুয়াখালীর রাখাইন জাতিসত্তাদের জমি ও ...জোর পূর্ব দখল করা হচ্ছে। তারা বিভিন্ন ...দলিলপত্র এ প্রতিবেদককে দেখান, যাতে জমি ...হাইকোর্টের বিভিন্ন মামলার রায়ও রয়েছে। ...অভিযোগ করে বলেন, কোর্টের রায় তাদের ...গেলেও তারা তাদের জমি ফিরে পান না। তাদের ...নানাভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছে ও তাদের ...জমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সরকার তাদেরকে ...শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে বাধ্য ...।

...অনশন কর্মসূচীতে ইউপিডিএফ, গণতান্ত্রিক ...জোট ও ১১ দলের নেতৃবৃন্দ সংহতি প্রকাশ ...। রাখাইন জাতিসত্তার বিভিন্ন সমস্যা ...সমাধানের জন্য সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ ...গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

..., তাদের প্রাথমিক দাবির মধ্যে ছিলো- ক) ...জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। ...শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের চাকরী ও ...সংস্থান দিতে হবে। গ) প্রচলিত আইন (...স্টেট একুইজিশন এন্ড ট্যানান্সি এ্যাক্ট) ...ধারার ৭, ৮ ও ৯ উপধারার বিধান অবিলম্বে ...ও কার্যকর করতে হবে।

সংগঠন সংবাদ

বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে ৮ মার্চ বিকাল ৪:৩০ টায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের (এইচ ডব্লিউ এফ) সভানেত্রী কবিতা চাকমা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সাংবিধানিকভাবে নারী পুরুষের সমান অধিকারকে স্বীকার করা হলেও বাস্তবে তা কখনো পালন করা হয়নি। অফিসে আদালতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাসে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়ে থাকে। মৌলবাদীরা নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছে মতো গ্রামের নিরীহ নারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করছে। দেশকে এখন মধ্যযুগের এক বর্বর দেশে পরিণত করার জন্য ফতোয়াবাজরা তালেবানী শাসন কায়েম করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি হাইকোর্ট ফতোয়া জারিকে বেআইনী ঘোষণা করে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। বক্তারা এ রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, হাইকোর্টের এ রায় দেশের নারী আন্দোলনকে আরো বেগবান করবে।

বক্তারা আরো বলেন, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলা নানিয়াচরে বিদেশী অপহরণের পর আশে পাশে এলাকায় সেনাবাহিনী তল্লাশীর নামে দুই জুম্ম নারীকে ধর্ষণ ও অন্য বেশ কয়েকজন নারীর ওপর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালানো হয়। বক্তারা এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষী সেনা সদস্যদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান।

বক্তারা এইচডব্লিউএফ-এর অপহৃত নেত্রী কল্পনা চাকমাকে উদ্ধারে সরকারের ব্যর্থতা ও এমনকি তদন্ত রিপোর্ট পর্যন্ত প্রকাশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমারী চাকমা, ইলিরা দেওয়ান, মেকী খীসা, চম্পানন চাকমা, পুলক চাকমা, রুইসা ম্রং মারমা, দীপংকর ত্রিপুরা ও ডমিনিক ত্রিপুরা প্রমুখ

কাজলং-সাজেক ভ্যালি থেকে শতাধিক পরিবার উচ্ছেদ

কাজলং প্রতিনিধি ॥ রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানাধীন কাজলং ও সাজেক ভেলী একটি বিস্তীর্ণ দুর্গম অঞ্চল। এখানে রয়েছে রিজার্ভ ফরেষ্ট। যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। পায়ে হেঁটে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতে হয়। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে সময় লাগে ৭/৮ ঘন্টা। এলাকার লোকজন জীবিকার জন্য মূলত গাছ বাঁশ ও জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। চাষ করার মতো জমি নেই বললেই চলে। লোকজন কোন ক্রমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের কারণে তাদের এই সামান্য জীবিকার সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদেরকে এখন সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের কড়া নজরদারীতে নিজের বাড়িঘর গ্রাম থেকে দূরে গুচ্ছগ্রামে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। কাউন্টার ইনার্জেন্সির নামে সেনাবাহিনী যে রকম গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি করেছিল সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরাও ইউপিডিএফ-কে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল হিসেবে ঠিক একই কায়দায় এই গুচ্ছগ্রামে নিরীহ জনগণকে আটকিয়ে রেখেছে।

জানা যায়, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ও মার্চ মাসের প্রথম দিকে সন্তু গ্রুপের ৩০/৪০ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল সাজেক ভেলীর লালু ও কালু এলাকায় বেশ কয়েকটি গ্রামে হানা দেয়। তারা লোকজনকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ও বন্দুকের নলের মুখে ঐ এলাকার ১৫০ জুমিয়া ও কাট্টন্যা পরিবারকে ভুইয়োছড়া নামক এলাকায় নিয়ে আসে। এখানে তাদেরকে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদেরকে প্রস্তুতি নেয়ারও কোন সময় দেয়নি। ফলে তাদেরকে সহায় সম্পত্তি যা ছিল তাও ফেলে আসতে হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে ছিলেন একজন গর্ভবতী মহিলা এবং ঐ সময় তার প্রসব বেদনা শুরু হয়। গ্রামবাসীরা তার পরিবারকে রেখে যাওয়ার আবেদন জানালে সন্ত্রাসীরা কড়া ভাষায় ধমক দেয়। ফলে তাকেও অন্যান্যদের সাথে ভুইয়োছড়ার পথ ধরতে হয়। পথে তার শূল বেদনা বেড়ে যায়। কিন্তু তাতেও সন্ত্রাসীদের বিবেক এক বিন্দু গলেনি। নিরুপায় হয়ে ঐ মহিলাকে নদীর ধারে ধাত্রী ছাড়াই সন্তানের জন্ম দিতে হয়।

হত দরিদ্র এই জুমিয়া ও কাট্টন্যা পরিবারগুলোকে ভুইয়োছড়ায় এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের পারমিশন ছাড়া কেউ বাইরে যেতে পারে না। সন্ত্রাসীরা সর্বক্ষণ তাদের চারপাশে সশস্ত্রভাবে পাহারা দিয়ে থাকে। এই কাট্টন্যা ও জুমিয়া পরিবারগুলো বেশীর ভাগই বাঘাইছড়ির বিভিন্ন স্থায়ী গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৮৪ সালে ভূষণছড়া-হরিণা গণহত্যা ও ১৯৯৮৬ সালে সার্বোতলী ও লংগদু গণহত্যার পর এরা নিজ জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ হন। অনেকের ঐ সব স্থায়ী গ্রামের পাশে এখনো নিজের জায়গা জমি রয়েছে। তবে সেগুলো বসতিস্থাপনকারীদের বেদখলে থাকায় তারা সেখানে যেতে পারেন না। উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে এরা কাজলং ও সাজেক ভেলীতে জুম চাষ অথবা রিজার্ভ ফরেস্টে বাঁশ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জেএসএস-এর আত্মসমর্পনের পর তাদেরকে পুনর্বাসন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্তু চক্র তাদেরকে বাঘাইছড়ি নিয়ে আসে। কিন্তু পুনর্বাসনের কয়েক বছরেও পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ না দেখে প্রতারিত বোধ করে তারা আবার জুম চাষের উদ্দেশ্যে তাদের পূর্বের জায়গায় ফিরে যান। সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের উৎপাতে বর্তমানে সেখানেও তারা থাকতে পারছেন না। তাদের সর্বশেষ ঠিকানা এখন ভুইয়োছড়ায় সন্তু চক্র নির্মিত গুচ্ছগ্রাম। আর কত কাল তাদেরকে এভাবে যাযাবর অবস্থায় অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করে থাকতে হবে তা তারা জানেন না। অনেকের অভিমত সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের অত্যাচার সেনাবাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। আগে তাদেরকে কেবল সেনাবাহিনীর অত্যাচার সহ্য করতে হতো, বর্তমানে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র লোকজনের উৎপীড়ন যোগ হয়েছে। তাদের প্রশ্ন এর শেষ কোথায়? সরকারের সাথে চুক্তি করে আন্দোলন গুটিয়ে ফেলে আত্মসমর্পন করার পরও কেন জেএসএস চুক্তি বাস্তবায়নের নামে এসব করছে তা তারা জানেন না।

কাপ্তাই বাঁধে নতুন দু'টি ইউনিট খোলার পরিকল্পনা: আবার জুম্ম উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

পিন্টু চাকমা

কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে পানি বাড়ানো হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও জনগণের মনে সংশয় এখনো কাটেনি। সরকারী কর্মকর্তাদের কথায় সাধারণ পাহাড়িদের কোন আস্থা নেই। কারণ এটা কোন মতেই বোধগম্য নয় দুটি ইউনিট বসানো হলে পানির স্তর একই থাকবে কি করে। পানি বাড়ানো হবে না বলে সরকারের প্রতিশ্রুতি আসলে ধোঁকাবাজিপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বাঁধকে ঘিরে আবার নতুন করে সমস্যা সংকট সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।। বর্তমান সরকার কাপ্তাই লেকের পানির ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নতুন দু'টি ইউনিট খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এর খরচের অর্থের যোগান দেবে জাপান সরকার। বর্তমানে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে, যার সিংহভাগ বাংলাদেশের সমতলবাসী মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। অথচ তার বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগও বিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে না, যদিও বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ঐ অঞ্চলে অবস্থিত এবং এটি নির্মাণের আগে পাকিস্তান সরকার পাহাড়িদেরকে উন্নয়নের নানা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ১৯৬০ দশকের প্রথমদিকে লক্ষাধিক পাহাড়ি উদ্বাস্তু হন। তাদের মধ্যে ৬০ হাজার ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। ৫৪ হাজার একর প্রথম শ্রেণীর জমি পানিতে তলিয়ে যায়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা ছিল তার এক দশমাংশও পাকিস্তান সরকার দেয়নি। ফলে কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়িদের জন্য যথার্থ অর্থেই মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্বিক ক্ষেত্রে এই বাঁধ সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

ঐ বাঁধ নির্মাণের প্রায় ৪০ বছর পর বর্তমানে বাঁধটি সংস্কারের নামে পানির স্তর বাড়ানোর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, যেন ৬০ দশকে লক্ষাধিক লোকজনকে নিজ বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা যথেষ্ট হয়নি। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নতুন করে আরো অনেকে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবেন।

সরকারের এই পরিকল্পনায় আঞ্চলিক পরিষদে অধিষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির ভূমিকা কি তা এখনো স্পষ্ট নয়, বরং যথেষ্ট ধোঁয়াটে। ইউএসসিবিসির ম্যানেজার ডিরেক্টর মাহবুবুর রহমান সন্তু বাবুকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিটি সন্তু লারমার এক সদস্যের কাছ থেকে পড়ে জানতে পারি কাপ্তাই বাঁধে আরো নতুন দুটি ইউনিট খোলা হবে, যা ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। পরে এও জানা গেল যে, জনৈক জেএসএস সদস্য ঐ ইউনিট খোলার প্রজেক্টে ঠিকাদার হিসেবে শেয়ারে কাজ করবে। আমি জেএসএস-এর উক্ত সদস্যকে বলি যে, নতুন দুটি ইউনিট খুলতে গেলে আরো পানি বাড়াতে হবে, যার ফলে আবারও পাহাড়ি জমি পানিতে তলিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি তা বিশ্বাস করলেন না এবং আমাকে জানালেন যে, কোন পানি বাড়াতে হবে না। পানির স্তর যেমন আছে তেমনই থাকবে। অতিরিক্ত কোন পানি বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। এরপর আমি তর্ক না করে চুপ রয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পর হঠাৎ একদিন প্রথম আলো পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয় যে, কাপ্তাই বাঁধে নতুন দুটি ইউনিট খোলা হচ্ছে এবং ৫ ফুট পানি বাড়ানো হবে। এর প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে মিছিল সমাবেশ করা হয়েছে। জেএসএস-এর এই দ্বৈত ভূমিকা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। তবে বিভিন্ন মহলের চাপ ও প্রতিবাদের ফলে সরকার বিশেষ টিম গঠন করতে বাধ্য হয়। একুশে টেলিভিশনের খবরে কিছুদিন আগে জানানো হয়, টিমের স্টাডি অনুসারে পাহাড়িদের নাকি কোন ক্ষতি হবে না। কারণ পানি বাড়ানো হবে না। এ ব্যাপারে কল্প বাবুকেও প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সরকারের সাথে তিনি নীতিগতভাবে একমত যদি পাহাড়িদের কোন ক্ষতি না হয়। পিডিবি'র চেয়ারম্যান জেনারেল সাহেবও বললেন পানির স্তর বাড়ানো হবে না, তাই ক্ষতি হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। পিডিবি'র অন্যান্য কর্মকর্তারাও একই সুরে কথা বলতে থাকেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে পানি বাড়ানো হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও জনগণের মনে সংশয় এখনো কাটেনি। সরকারী কর্মকর্তাদের কথায় সাধারণ পাহাড়িদের কোন আস্থা নেই। কারণ এটা কোন মতেই বোধগম্য নয় দুটি ইউনিট বসানো হলে পানির স্তর একই থাকবে কি করে। পানি বাড়ানো হবে না বলে সরকারের প্রতিশ্রুতি আসলে ধোঁকাবাজিপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

কারণ একটা গবেট মুর্খের কাছেও এটা পরিষ্কার যে, কাপ্তাই বাঁধের আগেকার পানি ধারণ ক্ষমতা ও বর্তমানের ধারণ ক্ষমতা কখনো এক নয়। অত্যধিক রান অফের ফলে ক্যাচমেন্ট এরিয়া থেকে পাহাড়ের পলি এসে জমা হয়েছে পানি থাকার জায়গাগুলোতে। ফলে পানি ধারণ ক্ষমতা আগের চাইতে অনেক কমে গেছে। তাই বছর দু'এক আগে থেকে নীচু এলাকার জমিগুলো (যেগুলো বছরে একবার মাত্র চাষ করা হয়) চাষ করা যাচ্ছে না। আবার অনেক সময় ফসল বোনা সম্ভব হলেও ফসল ঘরে তুলতে পারছে না। এর কারণ পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে পানির উচ্চতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে নতুন দুইটি ইউনিট বাড়ালে লাইভ স্টোরেজ পানি না বাড়িয়ে কিভাবে নতুন দুইটি ইউনিট চালানো সম্ভব তা বোধগম্য নয়।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ২০ জুলাই ২০০১ ❑ বুলেটিন নং ১৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়

সম্প্রতি রামগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেলো। গত ২৫ শে জুন বহিরাগতরা মিছিল সহকারে মারমাদের ৬টি গ্রামে হামলা চালায়। ২২৭টি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় হামলাকারীরা। তার আগে তারা ব্যাপক লুটপাট ও ভাংচুর চালায়। অনেক পাহাড়ি এই হামলায় আহত হন। প্রাণ রক্ষার্থে অনেকে সীমান্ত পাড়ি দেন। পরে তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাসের ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনা হয়। এই ঘটনা যে পূর্ব পরিকল্পিত তা যেভাবে ঘটনা ঘটেছে তা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘটনার সময় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ও এসপি রামগড়ে উপস্থিত ছিলেন। তারা হামলাকারীদের নিবৃত্ত করতে ও পাহাড়িদের রক্ষা করতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ঘটনাস্থল থেকে বিডিআর এর ক্যাম্প ও থানার দূরত্ব মাত্র কয়েক শ' গজ। পাহাড়িরা ক্যাম্পে আশ্রয়ের জন্য গেলে সেখান থেকেও তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এ সকল পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বা circumstantial evidence থেকে প্রমাণিত হয় যে মূলতঃ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তিসমূহ দাঙ্গা সংঘটন করলেও ঘটনার সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এর আগেও দীঘিনালায় দু'টি চুক্তি উত্তর পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে রামগড়ের এই দাঙ্গা প্রথম নয়। দাঙ্গা সংগঠিত হয়। প্রথম দাঙ্গাটি সংগঠিত হয় বাবুছড়া বাজারে সেনাবাহিনীর জনৈক সদস্য কর্তৃক একজন জুম্ম নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ২০০০ সালের ১৬ অক্টোবর এ ঘটনা ঘটে। শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ জানানোর পর সেনাবাহিনী ও বসতিস্থাপনকারীরা যৌথভাবে বাজারে আসা পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ চালায়। বাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি বৌদ্ধ মন্দিরেও সেনারা হামলা চালায়। অপর ঘটনাটি ঘটেছিল এ বছর ১৮ মে দীঘিনালার মধ্য বোয়ালখালিতে। এ সময় বহিরাগতরা বেশ কয়েকটি পাহাড়ি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ করা না হলে আরো অনেক গ্রাম তারা পুড়িয়ে ফেলত।

বস্তুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এ সরকারের পুরো শাসন কাল জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ছিল অশান্ত ও বিভিন্ন অঘটন ঘটনে পূর্ণ। পাড়া গ্রামে সেনা হামলা, তল্লাশীর নামে হয়রানি, গ্রেফতার, নির্যাতন, ধর্ষণ, জমি বেদখল প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক নিপীড়ন, খুন, গুম ইত্যাদি ঘটনা আগের মতো রয়েছে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৃদ্ধি পেয়েছে। চুক্তি উত্তর পরিস্থিতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পাহাড়িদের আন্দোলন দমনের জন্য জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্রকে লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা। জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসই হচ্ছে এ সরকারের নীতি। আর নীতি বাস্তবায়নের জন্য তিন এমপি'র সাথে জেএসএস-এর সন্তু চক্রও সরকারের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউপিডিএফ যৌথভাবে আন্দোলনের জন্য জেএসএস-এর নিকট বার বার ঐক্যের প্রস্তাব দিয়ে আসছে। সর্বশেষ গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর সুনির্দিষ্টভাবে তিন দফার ভিত্তিতে ঐক্যের প্রস্তাব দেয় উভয় পার্টির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে। ইউপিডিএফ এই বৈঠকে এটাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, জনসংহতি সমিতি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলে ইউপিডিএফ তাতে পূর্ণ সমর্থন জানাবে। সন্তু লারমা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে রক্ত দেয়ার শপথ নেন। পুনরায় অস্ত্র হাতে নেয়ারও হুমকি দেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি আজ পর্যন্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন কর্মসূচী ঘোষণা করেননি। বরং চুক্তি বাস্তবায়নে জেএসএস-কে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও সন্তু লারমা সরকার ও সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ইউপিডিএফ-এর ওপর অব্যাহতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো আত্মসমর্পনের পর জেএসএস-এর আর কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী নেই এবং এমনকি চুক্তি বাস্তবায়নেও তারা আর আগ্রহী নয়, যদিও চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য সন্তু লারমারা কান্নাকাটি করে থাকেন। তাদের আসল কর্মসূচী হচ্ছে আন্দোলনের নতুন শক্তি ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করা, জেএসএস-এর নিজের নাক কেটে হলেও ইউপিডিএফ-এর যাত্রা ভঙ্গ করা।

আর একটি বিষয় এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা দরকার। সেটা হচ্ছে সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। জেএসএস দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিল যে, তাদের চুক্তি মোতাবেক নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা না হলে তারা নির্বাচন প্রতিহত করবেন। সরকারকে হুমকি দিয়ে তিনি এক পত্রিকার সাথে সাক্ষাতকারে বলেন নির্বাচন প্রতিরোধের জন্য তারা নিজেরাই প্রয়োজনে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর হবেন। কিন্তু এখন সন্তু লারমার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে তিনি তার এই অবস্থান থেকে সরে এসে ১৮০ ডিগ্রী উল্টো অবস্থান নিয়েছেন। গত মাসে ঢাকায় এসে শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাতের পর পরই তার ঐ অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। সম্প্রতি কতিপয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে সুস্পষ্টভাবে তিনি এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। দৈনিক আজকের কাগজের ১৫ জুলাই-এর সংখ্যায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, "সন্তু লারমা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ এনে বলেন, আওয়ামী লীগ 'মীর জাফরী' করেছে। তাদেরকে ভোট দেয়ার প্রশ্নে আদিবাসীদের পুনরায় ভাবতে হবে। তিনি বলেন, আদিবাসীরা ইতিপূর্বে ভোট দিয়ে ঠকেছে। এবার তা হবে না। সুনির্দিষ্টভাবে, শর্ত সাপেক্ষে, আলোচনার ভিত্তিতে আদিবাসীরা এবার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।" এর মানে কি? এর মানে কি এই নয় যে, ভোটের প্রশ্নে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগের সাথে বোঝাপড়া করা? অতীতে বহু বার ঠকানোর পরেও কেন সন্তু লারমা এ কথা বলছেন?

সত্যি কথা বলতে কি, আত্মসমর্পনকারী উক্ত জেএসএস নেতাটি রাজনৈতিক ডিগবাজীতে ওস্তাদ। নীতি আদর্শচ্যুত জেএসএস নেতাদের কোন কথায় আর বিশ্বাস করা চলে না। কথা ও কাজের মধ্যে তাদের কোন মিল নেই। স্বৈরাচারী এরশাদের সাথে এ দিক দিয়ে তাদের কোন পার্থক্য নেই। এ ধরনের রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব অত্যন্ত ভয়ংকর ও বিপজ্জনক হতে বাধ্য। ইতিপূর্বেও সন্তু লারমা অনেক বার বিভিন্ন প্রশ্নে এক অবস্থান থেকে সরে গিয়ে উল্টো অবস্থান নিয়েছিলেন। যেমন, সরকার তার নিজের মতো তিন জন বাঙালীকে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যপদের জন্য মনোনয়ন দিলে তিনি ও তার দল সরকারের তীব্র বিরোধীতা করেন এবং কোন অবস্থাতেই পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু ঢাকা সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার পর সুর সুর করে তিনি আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে আসীন হন। এছাড়া তিনি শেখ হাসিনার ইউনেস্কো পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু সরকারের তলব পেয়ে ঢাকায় আসার পর তার সেই সিদ্ধান্ত উল্টিয়ে যায় এবং তিনি তার পিতার শেষকৃত্যানুষ্ঠান বর্জন করে শেখ হাসিনার সাথে প্যারিস গমনে বাধ্য হন।

এটা আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব পুরোপুরি আওয়ামী লীগের লেজুরে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের নেতৃত্ব কখনোই সঠিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে না। যার প্রমাণ আমরা জেএসএস-এর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে পেয়েছি। কাজেই বর্তমান সময়ে সন্তু লারমার নেতৃত্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক! আওয়ামী লীগের স্বার্থ ও জুম্ম জনগণের স্বার্থ কখনো এক হতে পারে না। এই আওয়ামী লীগই জুম্ম জনগণের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলে দেয়ার জন্য বাঙালী হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। শেখ মুজিবর রহমানের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে যে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণীত হয়েছিল পরবর্তী সরকারগুলো কেবল তা বাস্তবায়ন করেছে। কাজেই আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনের প্রশ্নে জুম্ম জনগণের স্বার্থ রক্ষাকারী কোন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি ঐক্য গঠন করতে পারে না। যদি কোন দল তা করতে যায় তাহলে তা দৃঢ়ভাবে বিরোধীতা করতে হবে। জুম্ম জনগণকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যে পার্টি জুম্ম জনগণের সত্যিকার বন্ধু, যে পার্টি আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের লেজুর নয়, নির্বাচনে সেই পার্টির পক্ষেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যা করতে হবে

সত্যদর্শী

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ চায় চিরঅবহেলিত সংঘাতময় এ অঞ্চলে সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক। এ জন্য দরকার শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন নির্বাসিত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সাথে একটি তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এ চুক্তির মাধ্যমে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি ও অরাজকতাকে স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে।

গত ১৫ জুলাই অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আমরা এই উপলক্ষে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ পূর্তির পর তার এই দায়িত্বগ্রহণ হচ্ছে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক। তার নেতৃত্বে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হলো দেশে সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন দলীয় সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ চায় চিরঅবহেলিত সংঘাতময় এ অঞ্চলে সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক। এ জন্য দরকার শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন নির্বাসিত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সাথে একটি তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এ চুক্তির মাধ্যমে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি ও অরাজকতাকে স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। চুক্তি উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির সমালোচনা করার কারণে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগি সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতা কর্মিদের ওপর অব্যাহত দমন পীড়ন চালানো, তাদের রাজনৈতিক ও সংবিধান স্বীকৃত অধিকার হরণ ও তাদের গণতান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দান। সরকার ও সন্তু গ্রুপ যৌথভাবে এই রাজনৈতিক নিপীড়নের জন্য দায়ি। চুক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত এ সংগঠনগুলোর দেড় শতাধিক নেতাকর্মিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৫০ জনের অধিক হয় সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী বাহিনী অথবা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে কোন প্রকার সভা সমাবেশ তাদেরকে করতে দেয়া হয়নি। বহু বার আয়োজিত সমাবেশ ভণ্ডুল করে দেয়া হয়েছে। এমনকি চট্টগ্রামে ইউপিডিফ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানও পুলিশ হামলা চালিয়ে ভণ্ডুল করে দেয়। এই অনুষ্ঠানে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিতে না পারে সেজন্য সন্তু গ্রুপ কোন প্রকার কারণ ছাড়াই তথাকথিত সড়ক অবরোধ আহ্বান করে ও সেই অবরোধ সফল করতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে যাতে ইউপিডিএফ -এর সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক ও মত প্রকাশের অধিকার লংঘন করা হয়েছে। ইউপিডিএফ-কে গলা টিপে হত্যা করা জন্য দাগী আসামী, সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের লেলিয়ে দেয়া হয়। খুন, অপহরণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি করতে তাদেরকে ফ্রি লাইসেন্স দেয়া হয়। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ইউপিডিএফ-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের কৌশল প্রয়োগ করা হয়। অপরদিকে, ইউপিডিএফ-কে ভিন্নভাবে চিত্রিত করতে শুরু হয় ব্যাপক অপপ্রচারণা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত যে কোন অঘটনের জন্য ইউপিডিএফ-কে দায়ি করা রেওয়াজে পরিণত হয়। উদ্দেশ্য একটাই : ইউপিডিএফ-কে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত করা যাতে এর ফলে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত দমন পীড়নকে জায়েজ করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন এমন এক অঞ্চল যেখানে শহীদের বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পন করাও হচ্ছে "রাষ্ট্রবিরোধী" কাজ। যেমন, গত ৩ ডিসেম্বর তারিখ পিসিপি'র কয়েকজন নেতাকর্মি গুইমারায় যায় মংশে মারমা নামে তাদের সংগঠনের একজন শহীদের বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পন ও সেখানে আয়োজিত গণসমাবেশে অংশগ্রহণ করতে। কিন্তু ইউপিডিএফ-এর সহযোগি সংগঠন পিসিপির এ ধরনের গণতান্ত্রিক কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সহ্য হলো না। লক্ষীছড়ি থেকে ... এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য অনুষ্ঠান স্থলে গিয়ে কোন ধরনের বাদ বিচার ছাড়াই অংশগ্রহণকারীদেরকে বেদম মারধর করে এবং ১২ জন পিসিপি নেতাকর্মিকে ধরে নিয়ে আসে। পরে সেনারা তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী মামলা দায়ের করে। এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়, তাদের কাছ থেকে ব্যাজ, পুষ্পমাল্য, লাইফ সাইজ ফটো পাওয়া গেছে এবং তারা চুক্তি বিরোধী বক্তব্য প্রদান করেছে। এই হচ্ছে রাষ্ট্র বিরোধীতা! স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, জাতীয় অখণ্ডতার নামে পার্বত্যবাসীকে আর কত হয়রানির শিকার হতে হবে? প্রশ্ন জাগে, এ দেশের রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা যে এতই ঠুনকো যে কালো ব্যাজ পড়লে, শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পন করলে অথবা চুক্তি বিরোধী বক্তব্য প্রদান করলে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে!

কেবল যে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগি সংগঠনগুলোর ওপর রাজনৈতিক পীড়ন চলছে তা নয়, চুক্তির পর সাধারণ জনগণের ওপরও সেনা অত্যাচার বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি সামরিক বাহিনীর অপারেশন ও নিপীড়ন নির্যাতন। সাধারণ নিরীহ জনগণের জীবনে আদৌ কোন শান্তি নেই। গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিন বিদেশীদের উদ্ধারের নামে সেনাবাহিনী পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালায়। তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়, ৭০ জনকে ধরে নিয়ে আসে এবং মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতন চালায়। সেনাবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাছাড়া সেনাবাহিনী অপহরণকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টির নামে দর্শীঘাট লক্ষীছড়ি এলাকায় হাজার হাজার একর বন পুড়িয়ে দেয়। এর ফলে কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ নষ্ট হয়। পরিবেশের ওপর ক্ষতি হয় আরও মারাত্মক। দেশের জাতীয় পত্র পত্রিকায় সে সময় সেনা নির্যাতনের ছিটে ফোটা প্রকাশিত হলেও সেনা বাহিনী কর্তৃক বন ধ্বংসের খবর কোন পত্রিকায় দেখা যায়নি।

বিদেশী উদ্ধারের নামে সেনা হামলা ছাড়াও পাহাড়িদের গ্রামে সেনাবাহিনীর "অপারেশন" এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের ঘটনার সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে, গত ২২ শে মে মাটিরাঙ্গা থানার দুর্গাবাড়ি সেনা ক্যাম্পের ১৮/২০ জনের একটি সেনা দল কর্তৃক গভীর রাতে বড়চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় হামলা। সেনা সদস্যরা অস্ত্র তল্লাসীর নামে সেখানে যায় এবং লোকজনকে মারধর করে ও তিন জন ত্রিপুরা মহিলাকে ধর্ষণ করে। তারা এক ব্যক্তিকেও ধরে নিয়ে আসে। এ ধরনের ঘটনা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে অহরহ ঘটছে যা সাধারণত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না।

আর একটি ব্যাপার এখানে উল্লেখ না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিটি এখন আগের মতো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এরা সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ মহল ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের মদদপুষ্ট। যে কোন সামান্য অজুহাতে এরা পাহাড়িদের বিরুদ্ধে বাঙালীদেরকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিয়ে থাকে এবং সাধারণ একটি ঘটনাকে এরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে নিয়ে

৭ম পাতায় দেখুন

আসন্ন নির্বাচনে ভোট দেব কাকে

॥ রাজনৈতিক ভাষ্যকার ॥

আসন্ন নির্বাচনে আর অন্য কোন দলের করুণার উপর নির্ভর করে পার্বত্যবাসী নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না। অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে এবার অবশ্যই নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে। সকল ষড়যন্ত্র ও বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে নিজেদের প্রার্থীকেই বিজয়ী করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

করে। তিন এমপি'র কেউই সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন দেবার ব্যাপারে কোন কথা বলেনি। আওয়ামি লীগ ধোঁকাবাজির যে পার্বত্য চুক্তি করে জনগণকে ঠকিয়েছে, তারও কোন প্রতিবাদ তারা করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন প্রতিনিয়ত খুন-খারাবি হচ্ছে। তা বন্ধ করার ব্যাপারে এই তিন এমপি'র কোন উদ্যোগ নেই। আওয়ামি লীগের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে তারা আজ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারেননি। জনগণের স্বার্থে তারা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু করবেন তারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। যারা বিএনপি'র টিকিটে এমপি হয়েছিলেন তাদের অবস্থাও ছিলো একই। আওয়ামি লীগ বা বিএনপি এই দলগুলোর স্বার্থ আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থ যে এক নয়, এটা আওয়ামি প্রার্থীকে জিতিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা পাওয়া গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আওয়ামি লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি বা জামাত এ ধরনের কোন দলেরই দালালি করতে পারেন না। তা একদিকে যেমন অশোভন আর আত্মঘাতিও। এই দলগুলোর স্বার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোটেও এক নয়। তবে স্রেফ ব্যক্তি সম্পর্ক ও স্বার্থের খাতিরে কারোর কারোর এই দলগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে এবং তাদের স্বার্থ সময় অবস্থা বিশেষে একও হতে পারে। আর সেটা হলেও হবে সাময়িক, যারা এ সব করছে তারা নিজেরাই বলছে 'আওয়ামি লীগ' নয় তারা করছে 'পেট লীগ'। যারা নিজের পেট ভরানোর জন্য 'পেট লীগ' করছে, তাদের স্বার্থের সাথে তো গোটা জনগণের স্বার্থ এক নয়। 'পেট লীগ' করা কোন ব্যক্তি বিশেষের আওয়ামি লীগ সরকারের কাছ থেকে মন্ত্রীত্ব, গাড়ী-বাড়ি, ব্যবসাপাতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া মানে তো পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়া নয়। এরশাদের সময়েও গুটিকতক টাউট বাটপাড় একই সুযোগ-সুবিধা ও মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলো, কিন্তু তখনও সমাধান হয়নি। জিয়াউর রহমানের সময়েও তাই পেয়েছিলো কেউ কেউ। তখনও একই অবস্থা। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষে আর 'পেট লীগ' করা লোকদের মিষ্টি কথায় ভুলে গেলে চলবে না। আগামী নির্বাচনে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করানোই হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সামনে এখন প্রধান কাজ। তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

আগামী নির্বাচনে পার্বত্যবাসীকে জাতকের কাঁকড়ার ন্যায় ধূর্ত বক সদৃশ্য প্রতারক আওয়ামি লীগকে গলা টিপে ধরে শায়েস্তা করতে হবে। পুষ্করণীর মাছগুলোর মতো নিজেদের ভাগ্য আওয়ামি লীগের উপর সমর্পণের অপরিণামদর্শী আত্মঘাতি কাজ করার বিলাসিতা দেখানোর আর সুযোগ পার্বত্যবাসীদের নেই।

অন্য কোন জাতীয় দলের লেজুড়বৃত্তি করা হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য আত্মঘাতি। এই জাতীয় দলগুলোকে একে একে চিনে নিতে হবে। প্রথমে আসা যাক জাতীয় পার্টি-এরশাদের ব্যাপারে। এরশাদের শাসনকাল সম্পর্কে বেশী বলারও দরকার নেই। এরশাদ ক্ষমতায় থাকলে কি কান্ডকারখানা ঘটায়, তা যে কোন ভদ্রলোকের আলোচনা করতে রুচিতে বাধে। এই এরশাদের জাতীয় পার্টি বিএনপি ও আওয়ামি লীগের মতো দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসবে, তা অন্যরা কেন স্বয়ং এরশাদ নিজেও আর মনে করতে পারেন না। দুর্নীতির কারণে নিজের সংসদ সদস্যপদ পর্যন্ত এরশাদ খুইয়ে বসে আছেন। আগামী পাঁচ বছর কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলেও হাইকোর্ট আদেশ জারি করেছে। এরশাদের দুর্দশা দেখে ইতিমধ্যেই তার 'অনেক দুধের মাছি' তাকে ছেঁড়া কোটের মতো ত্যাগ করে অন্য দলে লাইন দিয়েছে। তার জাতীয় পার্টি এখন পাল ছেঁড়া নৌকার মতো। এরশাদ নিজে এখন বন্যায় ভেসে যাওয়া লোকের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষার জন্য নানান কান্ডকারখানা শুরু করে মানুষের হাসির খোরাক যোগাচ্ছেন। তার ব্যাপারে দেশের জনগণ বেশী সময় ব্যয় করতে চায় না।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এরশাদের নাম শুনলে এখনো জ্বলে উঠেন। তার শাসনামলে এরশাদ যে জ্বালাও-পোড়াও দমননীতি চালিয়ে পাহাড়িদের ভিটে বাড়িছাড়া, বহু মা-বোনকে স্বামী-সন্তানহারা, বহু সম্ভাবনাময়ী যুবককে জীবনের জন্য পঙ্গু করেছেন, তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কখনই তাকে ক্ষমা করবে না। রাজনৈতিকভাবে মৃত এরশাদের ব্যাপারে দেশের জনগণের তেমন আগ্রহ না থাকলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে একজন অপরাধী হিসেবে এরশাদ ও তার দুষ্কর্মের সহযোগী সেনা কর্মকর্তাদের কথা বার বার উত্থাপিত হতে বাধ্য। এরশাদ ও জাতীয় পার্টিকে পার্বত্যবাসীর ভোট দেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার বিচার ও শাস্তির দাবিই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সব সময় করে যাবেন।

এরপর আসে জামাতে ইসলামীর প্রসঙ্গ। আফগানিস্তানের তালেবান দলটির কান্ড দেখেই এই দলটির নাম শুনলেই সচেতন নাগরিকরা আঁতকে উঠেন। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা কেন, খোদ মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকরা পর্যন্ত জামাতের উত্থানের ভয়ে শংকিত। তাদের ব্যাপারে বেশী মন্তব্যেরও দরকার নেই।

আর বিএনপি'র ব্যাপারেও বেশী কথা বলার দরকার হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বিএনপি'র তিন শাসককে দেখেছে। জিয়া, আবদুস সাত্তার ও সর্বশেষ খালেদা জিয়া। জিয়াউর রহমানই পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেটলার পুনর্বাসনের কাজ হাতে নেন। সামরিকভাবে সমাধানের লক্ষে দমন-পীড়ন চালান। '৮০ সালের কলমপতিসহ বহু হত্যাযজ্ঞের কথা পার্বত্যবাসী ভুলে যায়নি। জিয়ার মৃত্যুর পর আবদুস সাত্তার জিয়ার পদাঙ্কই অনুসরণ করেন। সাত্তার ছিলেন মেরুদন্ডহীন ও পুরোপুরি সেনাবাহিনীর ক্রীড়নক। সেনা প্রধান এরশাদই সাত্তারকে সামনে রেখে পেছন থেকে কল কাঠি নাড়িয়েছেন। '৯১ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি দ্বিতীয়বারের মতো দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চরিত্রগতভাবে বিএনপি আগের মতোই সেনা নির্ভর দল হয়ে থাকে। খালেদার আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ লোগাঙ ও নানিয়াচর হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হবার একেবারে শেষ পর্যায়ে বিএনপি এমন প্রচারণা শুরু করে দেয় যে, বিএনপি যদি আবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়, তবেই তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান দেবে!! ঠিক একই কথা এখন বলছে আওয়ামি লীগ। আওয়ামি লীগ যদি আবার ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হয়, তাহলে তখনই তারা চুক্তি বাস্তবায়ন করবে!!! পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান দেবে। মৌলিক চরিত্রের দিক দিয়ে এই দল দু'টি অভিন্ন। তাদের পার্থক্য শুধু বাইরের খোলস। দেশে দু' দু'বার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে ফেলেছে।

আসন্ন নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সবচেয়ে যে দলটির ব্যাপারে বেশী সতর্ক থাকতে হবে সে দলটি হচ্ছে আওয়ামি লীগ। এই দলটির মুখোশ এখনো জনগণের কাছে পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি। বৌদ্ধ জাতকের ধূর্ত বকটির মতো এ দলটি সংখ্যালঘুদের দরদী সেজে আছে। সে কারণেই এ দলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। এই দলটিকে না চিনলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। জামাতে ইসলামী দলটির কোন লুকোচুরি বা রাখঢাক নেই, দলটি দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম করতে চায়। তা তারা প্রকাশ্যে বলছে, গোপনেও সে লক্ষে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ দলকে আর চিনিয়ে দেয়ার দরকার করে না। বিএনপি ও জাতীয় পার্টিও পার্বত্যবাসীদের কাছে উলঙ্গ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু বাকী আছে আওয়ামি লীগ। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর সংখ্যালঘুদের প্রতি সহানুভূতিশীল এই মুখোশ পরে প্রচারণায় নেমে পড়েছে। বৌদ্ধ জাতকের মতলববাজ বুড়ো বক যেভাবে দরদী সেজে মাছের ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্নভাব দেখিয়ে পুষ্করণীর পাড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়, পাহাড়িদের ভোট পাবার মতলবে আওয়ামি লীগও তাই করেছে। ধূর্ত বকের লোকদেখানো কান্নায় বিশ্বাস স্থাপন করে পুষ্করণীর মাছগুলো নিজেদের ভাগ্য বকের হাতে সমর্পণ করে নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ক্ষমতায় গেলে আওয়ামি লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান দেবে এই ফাঁকা আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করার খেসারত আজ পার্বত্যবাসীকে দিতে হচ্ছে। ধূর্ত বককে শেষ পর্যায়ে কাঁকড়ার কাছে ধরা পড়ে মার খেতে হয়। আগামী নির্বাচনে পার্বত্যবাসীকে জাতকের কাঁকড়ার ন্যায় ধূর্ত বক সদৃশ্য প্রতারক আওয়ামি লীগকে গলা টিপে ধরে শায়েস্তা করতে হবে। পুষ্করণীর মাছগুলোর মতো নিজেদের ভাগ্য আওয়ামি লীগের উপর সমর্পণের অপরিণামদর্শী আত্মঘাতি কাজ করার বিলাসিতা দেখানোর আর সুযোগ পার্বত্যবাসীদের নেই। তবে এতে জনসংহতি সমিতি গোষ্ঠিটির চেলাচামুন্ডারা বাধ সাধতে পারেন। জেএসএস ও আওয়ামি লীগ এখন একসাথে নির্বাচন করবে বলে রূপায়ন চাকমা প্রকাশ করেছেন, যা বিবিসিতে প্রচারিত হয়েছে। জেএসএস-এর নির্বাচন করার বা প্রার্থী দেবার সাধ্য নেই। তারা আওয়ামি প্রার্থীর পক্ষেই কাজ করবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামি সরকারের পাতানো ফাঁদে পা না দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে যারা জীবনবাজি রেখে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে নেমেছে, সন্তু লারমা তাদেরকেই গলা টিপে হত্যা করতে ও হাত-পা ভেঙে দিতে তার ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আসন্ন নির্বাচনে তারা আওয়ামি লীগের ভাড়াটে মস্তান হিসেবে ব্যবহৃত হবে সে আলামতই দেখা যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে জনগণই ভোটের মাধ্যমে তাদের গলা টিপে ধরবে এবং রাজনৈতিকভাবে কবর দেবে। সন্তু লারমার সেই ঔদ্ধত্য, বেঈমানী ও সরকারের সাথে আঁতাতের জবাব দিতে হবে গণতান্ত্রিক পন্থায়। আওয়ামি লীগের অতীত ইতিহাস ও চরিত্র যাদের জানা নেই, তারা সুচতুর প্রচারণায় বিভ্রান্ত হতেও পারেন। এ দলটি অতীতে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলো না। এবং এখনো নয়। এতে বিভ্রান্ত হবার কোন অবকাশ নেই। '৪৯ সালে যখন এ দল গঠন হয় তখন ছিলো 'আওয়ামি মুসলিম লীগ'। পরে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও ইসলাম প্রতিষ্ঠাই ছিলো লক্ষ্য। '৭০ সালের আওয়ামি লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশকে(তখন অবিভক্ত পাকিস্তান) ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার কথা ছিলো। বাংলাদেশ হলে আওয়ামি লীগ আর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা না বললেও, বাঙালী জাতীয়তাবাদ জোর করে সবার উপর চাপিয়ে দেয়। '৭২ সালে শেখ মুজিবের কাছে লারমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দিতে গেলে মুজিব তাদের বসতে পর্যন্ত দেননি। ঘটনা তাতেই শেষ নয়, ৪ দফা দাবিনামা সম্বলিত স্মারকলিপি মুজিব লারমার মুখ বরাবর ছুঁড়ে মেরে বলেছিলেন, 'উপজাতি পরিচয় ভুলে গিয়ে বাঙালী হয়ে যাও।' লারমা তুমি বেশী বাড়াবাড়ি করো না। হাতের তুড়ি মেরে বলেছিলেন প্রয়োজনে ১,২,৩,৪,৫.... ...১০ লক্ষ বাঙালী ঢুকিয়ে তোমাদের ধ্বংস করবো।' '৭৩ সালে রাঙামাটির পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং মাঠের জনসভায় শেখ মুজিব পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। একই কায়দায় শেখ হাসিনা '৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রখর রৌদ্রে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মাঠে বসিয়ে রেখে, দেশী-বিদেশী দর্শক পর্যবেক্ষকদের সামনে বলেছিলেন 'পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালী সবাই থাকবে। সেনাবাহিনী থাকবে।' এবং বাস্তবে আছেও। আওয়ামি লীগ তাদের প্রত্যাহার করে নেয়নি। ভবিষ্যতে নেবে তারও কোন সম্ভাবনা নেই। এ দলকেও চেনা হয়ে গেছে।

আসন্ন নির্বাচনে আর অন্য কোন দলের করুণার উপর নির্ভর করে পার্বত্যবাসী নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না। অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে এবার অবশ্যই নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে। সকল ষড়যন্ত্র ও বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে নিজেদের প্রার্থীকেই বিজয়ী করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। ᄀ

পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক নিপীড়নের ইতিহাসকে বৈধতাদানের প্রয়াস

প্রশান্ত ত্রিপুরা

'সুশীল সমাজে' ঠাঁই করে নেয়া একজন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক সেনাধ্যক্ষের প্রকৃত চেহারা জনসমক্ষে উন্মোচন করাটা কি সত্যিই অভদ্রজনোচিত হবে? 'ওদেরও দোষ ছিল, আমাদেরও দোষ ছিল', এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক নিপীড়নের প্রকৃত ইতিহাসকে আড়ালে ঠেলে দেয়ার প্রক্রিয়া চোখের সামনে ঘটতে দেখলে নীরব থাকাটা কি নৈতিক হবে?

আমি সিগারেট ধরি ১৯৮৯ সালে। সময়টা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি ক্রান্তিকাল। ওই সময় সৈরাচারের কিছু ঘটনায় আমি জড়িয়ে পড়ি, যার জের ধরে একটা পর্যায়ে আমি সিগারেট খাওয়া ধরি। সেই সময় বা পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা আমি দূরত্ব দূর থেকেই অনুধাবন করেছি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিগত দু-তিন দশকের ইতিহাসে আমি নিজে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে না পারলেও সেই ইতিহাস ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার জীবনে বিভিন্ন সময় যেমন ছাপ ফেলেছে, সেগুলো আরো অনেকের মতো আমি এখনো বয়ে চলছি। যেমন সিগারেটের প্রতি আসক্তি আমার এখনো কাটেনি। একান্তই ব্যক্তিগত এ ধরনের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গল্প বলার কোনো কারণ থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আমার এই গল্পের পেছনের গল্পটি বলার তাগিদটা তীব্রভাবে বোধ করছি একটি বই হাতে পাওয়ার পর থেকে। আমার গল্পটি শোনার পর আশা করি পাঠক বুঝবেন কেন আমি একান্তই 'ব্যক্তিগত' কিছু বিষয়ের অবতারণা করছি।

বেশ অনেক বছর যাবৎ একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা হাতে একটি নতুন অস্ত্র তুলে নিয়েছেন: কলম। তিনি হচ্ছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে এরশাদ সরকারের একটি মিশন সফল করে তোলার প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত দক্ষতা ও দাপটের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা একজন অফিসার - মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক (অবঃ) (তৎকালে কর্নেল)। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন শিরোনামে তাঁর লেখা একটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, যা গত ১১ মে ২০০১ দৈনিক প্রথম আলোর 'শুক্রবারের সাময়িকী' বিভাগে পর্যালোচিত 'অমর একুশে বইমেলা ২০০১-এর নির্বাচিত ১০টি মননশীল বই'-এর তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। বইটির কথা জানার পর পরই এটি আমি জোগাড় করতে খুব আগ্রহী হয়ে উঠি। বইটি হাতে পাওয়ার পর এটিতে আমি চোখ বুলাতে শুরু করেছি মাত্র, তবে তার ভিত্তিতে বলা যায়, বিভিন্ন বিচারে এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বইটির সার্বিক মূল্যায়নে আমি যাব না, কাজটা আমার চেয়ে যোগ্যতর কেউ নিশ্চয় যথাসময়ে করবেন। এখানে আমি বইটি সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন তুলে ধরব মূলত খাগড়াছড়িতে এটির লেখকের কর্মতৎপরতা একদিনের জন্য প্রত্যক্ষ করার যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে।

জেনারেল ইবরাহিমের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৯৮৯ সালে। ওই বছরের আগে পরে তৎকালীন কর্নেল ইবরাহিম ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক ঘটনার কেন্দ্রীয় নায়ক। তিনি হয়ে উঠেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে তখনকার চলমান 'শান্তি প্রচেষ্টা'র মূর্ত প্রতীক, যা বোঝা যায় *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ* পত্রিকার ১৯৮৯ সালের ২৩ মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদে ছাপানো তাঁর বিশাল ছবি দেখলে (ওই প্রচ্ছদে জেনারেল এরশাদের ছবিও ছিল, তবে খুব ছোট আকারে, ইনসেটে; *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ*র পুরো প্রচ্ছদটাই আবার জেনারেল ইবরাহিমের আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদে পুনরুৎপাদিত হয়েছে)। আমি তখন পড়াশোনা করতাম আমেরিকায়, দেশে এসেছিলাম একটা লম্বা ছুটি কাটাতে। খাগড়াছড়ির বাড়িতে বসে এক ধরনের অলস এবং বিচ্ছিন্ন জীবনই আমি কাটাচ্ছিলাম। মাঝে মধ্যে হয়তো এদিক-ওদিক ঘুরতাম। চারপাশে কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করতাম। তখন চলছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক কায়দায় 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার জোর প্রয়াস, ইবরাহিম সাহেব তাঁর বইতে 'শান্তি প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় ধাপ' হিসেবে যে সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন সেটির অন্তিম বছর। এরশাদ সরকারের লক্ষ্য ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠির কিছু অংশের সমর্থন নিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' গঠন করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দেখানো যে, 'স্বায়ত্তশাসনে'র দাবি মেটানো হয়েছে।

কর্নেল ইবরাহিম পরিচিত ছিলেন একজন চৌকস সেনা অফিসার হিসেবে, যিনি এরশাদ সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোকে পাহাড়ি গ্রামবাসীদের ধরে বেঁধে 'গুচ্ছগ্রামে' নিয়ে এসে বসানো - সব ধরনের কর্মতৎপরতায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমি যে সময় ছুটিতে বাড়ি যাই, সে সময় তিনি অক্লান্তভাবে জনসংযোগের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরশাদ সরকারের পরিকল্পনা জনগণের সামনে 'ব্যাখ্যা' করার লক্ষ্যে তিনি দিনের পর দিন বিভিন্ন সভার আয়োজন করছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই সভাগুলো ছিল সম্প্রদায় বা শ্রেণীভিত্তিক। আজ ত্রিপুরাদের সঙ্গে, কাল মারমাদের সঙ্গে, সকালে একদল চাকমার সঙ্গে, বিকেলে বাঙালি ব্যবসায়ী বা সেটলারদের সঙ্গে। এরকমই একটা সভায় আমি উপস্থিত হয়েছিলাম স্রেফ কৌতূহলবশত। আমার সঙ্গে ছিল আমার কিছু বয়োকনিষ্ঠ বন্ধু।

গিয়ে দেখি সভাটা একটা পাঠদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠিত হয়েছিল খাগড়াছড়ি হাই স্কুলের একটি শ্রেণীকক্ষে। মাস্টার মশাই স্বয়ং কর্নেল ইবরাহিম। উদ্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে জড়ো করা বিভিন্ন শ্রেণীর ত্রিপুরা নারী-পুরুষ। ডায়াসে ত্রিপুরা সমাজের কিছু নেতা ছিলেন কর্নেল সাহেবের সহকারী ভূমিকায়। সরকার কেন কীভাবে সে বছর প্রণীত 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' আইনের আওতায় নির্বাচন দিতে চাচ্ছে, নির্বাচন হলে কী লাভ হবে, না হলে কী ক্ষতি হবে, কেন শান্তিবাহিনী এই আইনের বিরোধীতা করছে বা নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা দিচ্ছে ইত্যাদি বিষয় মাস্টার মশাই বোঝাচ্ছিলেন উপস্থিত শ্রোতা দর্শকদের। অনেকক্ষণ ধরে চলল লেকচার। এরপর দুজন সহকারীকে দুই পাশে দুটো টুলের ওপর দাঁড় করানো হলো, যারা পর্যায়ক্রমে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিগুলো আবার তুলে ধরলেন। সবশেষে এল প্রশ্নোত্তর পর্ব, যা আসলে ছিল পরীক্ষাপর্ব। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না, প্রশ্ন করছিলেন মাস্টার মশাই নিজে। 'নির্বাচন হলে কী কী সুবিধা হবে বলুন তো দেখি?' ইত্যাদি। শুরুতে স্তাবক শ্রেণীর কিছু শ্রোতা তোতাপাখির মতো আউড়ে গেলেন শেখানো বুলিগুলো, কিন্তু একটা পর্যায়ে আর কোনো উত্তরদাতা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছিলেন না। এরপর কর্নেল সাহেব শুরু করলেন দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থী নির্বাচন - যেমন তিনি হয়তো দিয়াশলাই বাক্স ছুড়ে মারলেন, যার গায়ে লাগবে তাকে উত্তর দিতে হবে। এ তামাশা চলতে থাকল অনেকক্ষণ।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল, ভ্যাপসা গরমে অস্বস্তিকর অবস্থায় সবাই নীরবে এ অপমান সহ্য করে যাচ্ছিল, তবু মাস্টার মশাইয়ের ক্লাশ শেষ হচ্ছিল না। একটা সময় পুরো শ্রেণীকক্ষে অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এল, তাঁর চোখ পড়ল শেষ সারির বেঞ্চগুলোর একটিতে বসা আমাদের দিকে। আমার ঠিক পাশে বসা একজনের দিকে তাঁর চোখ পড়ল, তাকে বলা হলো দাঁড়াতে এবং বলতে, 'এতক্ষণ কী আলোচনা হলো?' সে বলল। মাস্টার মশাই হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ভুল উত্তরের জন্য নয়, ছাত্রটি উত্তর দিয়েছিল ১০০ ভাগ নির্ভুলভাবে। এটিই হয়ে গেল তার অপরাধ। মাস্টার মশাই রেগে গেলেন এ কথা ভেবে যে, যখন তিনি আহ্বান জানাচ্ছিলেন কে পড়া মুখস্থ করতে পেরেছে দাঁড়িয়ে বলার জন্য, তখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার সঙ্গীটি দাঁড়িয়ে পড়েনি। 'উত্তর জেনেও চুপ কর[illegible] কেন? অ[illegible] তোমাদের?' মাস্টার মশাইয়ের এ কথা [illegible] আমি নিজে[illegible] অজান্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এক্সকিউজ মি!' আমার এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়ায় মাস্টার মশাইসহ পুরা শ্রেণীকক্ষ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। আমি নিজেও তখন এত উত্তেজিত ছিলাম যে, আমি বুঝতে পারছিলাম না কী বলতে যাচ্ছি, কী করতে যাচ্ছি। চকিতে মাস্টার মশাই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কেন? এক্সকিউজ মি কেন?' আমি বললাম, 'অসভ্য বলে আপনার গালি দেয়াটা ঠিক হয়নি।' তিনি বললেন, 'উত্তর জেনেও চুপ করে বসে থাকা কেন, এখানে কি তামাশা দেখতে আসা হয়েছে?' এর উত্তরে আমি যখন বললাম, 'উত্তর না দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে।' তিনি বললেন, 'এখানে অধিকার নিয়ে তর্ক করতে আমরা আসিনি। আপনার ভালো না লাগলে আপনি বেরিয়ে যান।' আমি তৎক্ষণাৎ আর একটি কথাও খরচ না করে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করে চলে যাই কারো জন্য অপেক্ষা না করে, এবং এরপর ক্লাস আর কতক্ষণ চলেছিল, কী হয়েছিল কিছু জানার চেষ্টা করিনি। আমার কানে সারাক্ষণ শুধু একটি কথায় বেজে চলছিল, 'এখানে আমরা অধিকার নিয়ে তর্ক করতে আসিনি', যেটার অনুরণন আমি এখনো শুনতে পাই। আমার তরুণ বন্ধুরা, যারা পরে বলছিল যে তাদেরও উচিত ছিল আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসা, তারা আত্মপীড়নে ভুগছিল তাদের বিলম্বিত উপলব্ধির কারণে, এবং দু-একজন তাদের গ্লানি ও অপমানবোধের তাড়নায় সে রাতেই শান্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে। আমি অবশ্য তাদের নিবৃত্ত করেছিলাম, যেহেতু যে পথে তাদের আমি ঠেলে দিতে পারতাম, সে পথ কোনদিকে মোড় নেবে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে, এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না।

আমার সিগারেট ধরার ইতিহাস পুরোটা বলতে গেলে ওপরে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ করতে হয়। কর্নেল সাহেবের ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসার পরও আমি কিছুটা উদ্দেশ্যহীন জীবনই কাটাচ্ছিলাম, সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতাম না বা সে রকম কোনো চিন্তা আমার মাথায় আসত না। তবে কিছুদিন পরে, ৪ মে ১৯৮৯ সালে ঘটে যায় 'লংগদু হত্যাকাণ্ড'। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০ মে ১৯৮৯ সালে ঢাকার রাজপথে দেখা যায় একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য। সেদিন লংগদু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত বিশাল সংখ্যক পাহাড়ি ছাত্রছাত্রী বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে নীরবে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এবং এরপর সংগঠক ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রতিনিধি দল প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে। আমিও মিছিলে উপস্থিত ছিলাম এবং তরুণ সংগঠকদের অনুরোধে সংবাদ সম্মেলনেও তাদের সঙ্গে ছিলাম। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর কয়েকজন মিলে দিচ্ছিলেন, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এক পর্যায়ে কোন একজন সাংবাদিক যখন আমার পরিচয় জানতে চাইলেন, তখন আমি কিছু বলার আগেই আমার পাশে বসা একজন কী ভেবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল উক্ত মিছিল আয়োজনকারী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বা সে জাতীয় কিছু একটা হিসেবে। (উল্লেখ্য, এই মিছিল ও সংবাদ সম্মেলনের দিনটাই ছিল বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আবির্ভাব দিবস, যে সংগঠনের প্রথম রূপ ছিল এডহক ভিত্তিতে গড়ে তোলা একটি কমিটি।) ২০ মে ১৯৮৯-এর সেই প্রতিবাদ মিছিল বা সংবাদ সম্মেলনের কোন খবর দেশীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে (জাতীয় দৈনিকসমূহ) প্রচার পায়নি বটে, কিন্তু সে রাতেই বিবিসিসহ ভয়েস অফ আমেরিকা, আকাশবাণী প্রভৃতি বিদেশী বেতার মাধ্যমে খবর প্রচারিত হয় যে, 'প্রশান্ত ত্রিপুরার নেতৃত্বে লংগদু হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি মৌন প্রতিবাদ মিছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে...।' ব্যাপারটি তখন বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে আমাকে অভিনন্দন জানানো শুরু হয়ে যায়, এবং আমি যথেষ্টই বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম এই অযাচিত 'খ্যাতি'তে এবং এ কথাও ভেবে যে, না জানি মূল সংগঠকরা এই ভেবে ক্ষুণ্ণ হয় যে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের পরিশ্রমের কৃতিত্ব কেড়ে নিয়েছি। যা হোক, অভিনন্দনের পাশাপাশি কিছু কিছু মহলে আমার বিরুদ্ধে প্রচারণাও শুরু হয়ে যায় এবং খাগড়াছড়িতে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ওখানে ফিরলেই সেনাবাহিনী আমাকে আটক করবে। অনেকেই সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন কর্নেল ইবরাহিমের শ্রেণীকক্ষ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণে আমি ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ি থেকে আমি জরুরী টেলিগ্রাম পাই, 'এ মুহূর্তে তুমি আমেরিকার প্লেন ধরার ব্যবস্থা করো, তোমার মালামাল ঢাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে...।' যা হোক, আমার পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগ উপেক্ষা করে আমি সিদ্ধান্ত নিই কিছুদিন ঢাকায় বসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের এবং প্রায় একমাস আমি একটি ছাত্রাবাসে আমার এক ধূমপায়ী বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাই। সেই সময়টাতেই শুরু হয় আমার সিগারেট আসক্তি।

আমি আমার নিকোটিনাসক্তির জন্য জেনারেল ইবরাহিমকে দায়ী করার লক্ষ্যে এ প্রবন্ধ লিখতে বসিনি। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং তাঁর ক্লাশরুম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তার অজান্তে নতুন এক ভূমিকায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, এমনকি তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। 'শান্তিচুক্তি'র পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এক সেমিনারে একজন নির্ধারিত আলোচক হিসেবে আমি অংশ নিতে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করি অন্যান্য আলোচকের মধ্যে জেনারেল ইবরাহিমও রয়েছেন, এবং আমাদের সেশনগুলো আলাদা হলেও একটা পর্যায়ে দেখলাম তিনি মঞ্চে আমার পাশের একটি চেয়ারে বসে আছেন। পরস্পরের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করিনি সেবার। উল্লেখ্য, এর বেশ ক বছর আগে একবার একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকি যখন জানতে পারি যে, সেখানে ইবরাহিম সাহেবও (তখন তিনি সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার পদে ছিলেন) থাকবেন, কারণ আমার মনের মধ্যে এমন আশংকা বিরাজ করছিল যে, হয়তো তাঁর উপস্থিতিতে কোনো বক্তব্য দিতে গিয়ে আমার অজান্তেই চেতনার গভীরে লুকিয়ে থাকা ক্ষোভ-বেদনা-গ্লানি এসে আমাকে আবেগাপ্লুত করে ফেলতে পারে। অনেকটা একই চিন্তায় চট্টগ্রামের সেই সেমিনারেও আমি আমার সেশন শেষ হওয়ার পর আর সেমিনার কক্ষে থাকিনি। তবে পরে বুঝতে পারি, আমার জেনারেল সাহেবকে এড়িয়ে চলার নীতিটা হয়তো বা ভুল ছিল। আমার এই উপলব্ধি হয় যখন রাতে সেমিনার-পরবর্তী নৈশভোজে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমাকে বলেন যে, জেনারেল ইবরাহিমের বক্তব্য শুনে একটা বিষয়ে নাকি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। ওই শিক্ষক আমাকে বলেন, তিনি বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। কিন্তু জেনারেল সাহেব নাকি সুন্দরভাবে সংশ্লিষ্ট সকল দিক তুলে ধরেছিলেন; তিনি নাকি স্বীকার করেছিলেন, 'হ্যাঁ, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কিছু 'ভুল' করেছে, কিন্তু সব পক্ষই বিভিন্ন ভুল করেছে, এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার স্বার্থে সেখানে যে ভূমিকা রেখেছে, সব মিলিয়ে তা ছিল অপরিহার্য ও যথার্থ।' ওই সহকর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জেনারেল ইবরাহিমের সফল ভূমিকা আমাকে ভাবাতে শুরু করে। 'সুশীল সমাজে' ঠাঁই করে নেয়া একজন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক সেনাধ্যক্ষের প্রকৃত চেহারা জনসমক্ষে উন্মোচন করাটা কি সত্যি[illegible] অভদ্রজনোচিত হবে? 'ওদেরও দোষ ছিল, আমাদেরও দো[illegible] ছিল', এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম[illegible] নিপীড়নের প্রকৃত ইতিহাসকে আড়ালে ঠেলে দেয়ার প্রক্রি[illegible] চোখের সামনে ঘটতে দেখলে নীরব থাকাটা কি নৈতি[illegible] হবে? (চট্টগ্রামে একই মঞ্চে বসা অবস্থায় জেনারেল ইবরা[illegible] যে আমাকে 'চিনতে' পারেননি, সেটা আমি পরে বুঝ[illegible] পারি, যখন তিনি আমাকে তাঁর পরিচালনাধীন একটি প্রতি[illegible] আয়োজিত একটি আলোচনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আম[illegible] জানাতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি তাঁর আম[illegible] পত্রের ওপর হাতে লিখে দিয়েছিলেন, 'চট্টগ্রামের সেমি[illegible] আমাদের পরিচয় হয়েছিল।')

আমার অবাক লেগেছে প্রথম আলোর 'নির্বাচিত ১০[illegible] মননশীল বই'-এর তালিকায় জেনারেল ইবরাহিমের বই[illegible] অন্তর্ভুক্তি দেখে। তবে যখন ভেবে দেখি, চিন্তা চেত[illegible] স্পষ্টতই স্বৈরাচার বিরোধী এমন একজন সহকর্মী (চট্ট[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শিক্ষক) যেখানে জেনারেল সাহে[illegible] বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তি মেনে নিতে শুরু করেন [illegible] পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর প্রয়োগ করা সামরিক দমন নী[illegible] অপরিহার্য ছিল, তখন বুঝতে পারি যে, একইভাবে স[illegible] বহু জায়গায় একই ধরনের বক্তব্য দিয়ে এই জেনারেল ব[illegible] 'সুশীল সমাজে' সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে[illegible] 'মননশীল' বইটির দুয়েক পাতা উল্টাতেই চোখে পড়া [illegible] কিছু বাক্য যেগুলো আসলেই চিন্তার খোরাক জোগায়। [illegible] জেনারেল ইবরাহিম লিখেছেন, 'বাঙালীদেরও দোষ ছি[illegible] শান্তিবাহিনীরও দোষ ছিল' (পৃ. ২১৮)। ঠিক সেই ধর[illegible] কথা, যেগুলো বলে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক স[illegible] আয়োজিত সেমিনারে আসর মাত করেছিলেন। [illegible] রাষ্ট্রযন্ত্রই যেখানে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে দাঁড়ি[illegible] যায়, সেখানে রাষ্ট্রের 'ভুল' আর অন্য পক্ষের হয়ে অস্ত্র [illegible] তুলে নেওয়া কোন সংগঠনের 'ভুল' কি এক পাল্লায় [illegible] সম্ভব? আমি জানি না, জেনারেল ইবরাহিম কোথাও স্বী[illegible] করেছেন কিনা, 'হ্যাঁ, আমি নিজেও কিছু ভুল করেছি। [illegible] করেছি অনেক পাহাড়ি মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থে[illegible] উচ্ছেদ করে 'গুচ্ছগ্রামে' বসিয়ে, ভুল করেছি সেটলারদে[illegible] মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, ভুল করেছি এরশা[illegible] সরকারের হুকুম সোৎসাহে তামিল করে।' আমার ধার[illegible] তিনি করেননি, করবেন না, এবং সুশীল সমাজে'র [illegible] হয়তো বা তাঁকে সেটা করার আহ্বান জানাবেন না। [illegible] আমি এই লেখার মাধ্যমে সে আহ্বান জানাচ্ছি তাঁকে, [illegible] সংশ্লিষ্ট অন্য সব ব্যক্তি ও পক্ষকে।

আমি আগেই বলেছি, জেনারেল ইবরাহিমের মোটামু[illegible] ৫০০ পৃষ্ঠার বইটির মাত্র কিছু পৃষ্ঠা আমি এ যাবৎ পড়ে দেখে[illegible] প্রথম আলোতে বইটির পর্যালোচনা যিনি করেছেন, আলতা[illegible] পারভেজ, তাঁর আলোচনায় জেনারেল ইবরাহিম সম্প[illegible] এক ধরনের মুগ্ধতা এবং বইটি সম্পর্কে উচ্ছ্বাস ফুটে উঠে[illegible] তিনি নাকি বইটি শেষ করেছেন 'এক বৈঠকে।' এমন মুগ্ধ[illegible] এমন উচ্ছ্বাস আমি মনে করি, অত্যন্ত বিপজ্জনক। [illegible] কথাগুলো বলছি তা বোঝানোর জন্য আমি বইটির একে[illegible] শেষ পৃষ্ঠা থেকে একটা অংশ তুলে ধরতে চাচ্ছি। পার্ব[illegible] চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জেনারেল ইবরাহি[illegible] তাঁর ছয়টি ব্যক্তিগত মূল্যায়নের শেষটি তুলে ধরেছেন এভা[illegible] 'সুদূর জাপান থেকে শুরু করে কোরিয়া, চীন, মঙ্গোলি[illegible] ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, বার্মা বা মায়ানমার [illegible] দেশ হয়ে মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠির একটি অংশ উপচে পড়[illegible] উত্তর-পূর্ব ভারতে। এরই মধ্যকার একটি ক্ষুদ্র অংশ উপ[illegible] পার্বত্য চট্টগ্রামে। যদিও বহির্বিশ্বে তথা সভ্যতার সঙ্গে পার্ব[illegible] চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠির সম্পর্ক চট্টগ্রামের মাধ্যমে, তথাপি মন[illegible] ভিতর যেই মন, সেই মনে একটা টান থেকে যায় গভীর[illegible] ও গহীনতর অরণ্য ও উচ্চতর পর্বতমালার জনগোষ্ঠির দি[illegible] যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে ও পূর্বে বসবাসরত। এই [illegible] কথাটি ভুলে গেলে ভুল হবে।' সুললিত, প্রায় কাব্যিক ভা[illegible] লেখা এই উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের প্রতিটি লাইন জুড়ে র[illegible] বহুমাত্রিক বহু ব্যঞ্জনায় ভরা অনেক শব্দ ও বাক্যাংশ, যে[illegible] গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার মতো। জেনারেল ইবরাহি[illegible] কথাটি মোটেও 'ক্ষুদ্র' নয়। জানি না ওপরের উদ্ধৃ[illegible] বাক্যগুলোতে বর্ণবাদী ধ্যান-ধারণার যে স্পষ্ট প্রতিফ[illegible] আমি দেখতে পাই, তা অন্য কোন পাঠক দেখতে পা[illegible] কিনা, আলতাফ পারভেজ দেখতে পেয়েছেন কিনা।

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, *প্রথম আলোর* 'নির্বাচিত [illegible] মননশীল বই'-এর তালিকায় অন্য যে লেখকদের নাম র[illegible] তাঁদের একজন মোহাম্মদ রফিক। মোহাম্মদ রফিকের '[illegible] শালা কবি হবে' কবিতাটির গল্প আমি শুনেছিলাম অনে[illegible] থেকে বেশ পরে। কবিতাটি সরাসরি না পড়লেও জে[illegible] কার উদ্দেশ্যে এটি লেখা ছিল। *প্রথম আলোতে* মোহা[illegible] রফিকের ঠিক পাশেই এরশাদের একজন একনিষ্ঠ অনু[illegible] সহযোগীর ছবি ছাপা হয়েছে, ব্যাপারটা কি নেহাত[illegible] কাকতালীয়? নাকি এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হ[illegible] বাংলাদেশের 'সুশীল সমাজ' পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা [illegible] দেশে বহু বছর ধরে যে সামরিক স্বৈরশাসন বলব[illegible] তাকে মেনে নিতে, বৈধতা দিতে শুরু করেছে? সকল 'মন[illegible] পাঠকের প্রতি এই প্রশ্ন রেখে আমি শেষ করছি আমার '[illegible] ভেতরের মনে' লুকিয়ে থাকা একান্তই ব্যক্তিগত কিছু গ[illegible] পেছনের গল্প বলার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সৌজন্যে : প্রথম আলো, ২৯ জুন ২০০১

…ীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যা করতে হবে

চতুর্থ পাতার পর

… পরিস্থিতি হয় ভয়াবহ। সম্প্রতি … ও রামগড়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা … উদাহরণ। এই উভয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা … দাঙ্গাকারীরা দুই জন বাঙালী নিহত … ঘটনাকে ব্যবহার করে। চাঁদাবাজ, … যারাই তাদেরকে হত্যা করুক, এ ধরনের … অবশ্যই নিন্দনীয়। তার জন্য অবশ্যই বিচার … প্রয়োজন হত্যাকারীদের গ্রেফতারও করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘটনাকে চাঁদাবাজি … হত্যাকাণ্ড হিসেবে না দেখে তাকে … লাইনে নিয়ে যাওয়া মোটেই ভালো কাজ …

… ও রামগড়ে সংঘটিত দুইটি দাঙ্গা ঘটনা … করলে দেখা যাবে এখানে দাঙ্গা সংঘটনের … চিত্র একই। বাঙালী সম্প্রদায়ের কোন … নিহত হওয়ার ঘটনাকে ব্যবহার করে … গ্রামে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ … হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে এ যাবত … দেশে যে সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত … হতে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় শক্তি অথবা কোন … দলের উস্কানি, মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা … সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটন করা যায় না। … চট্টগ্রামেও এ অনুসিদ্ধান্তটি বার বার প্রমাণিত … মূলত সেনাবাহিনীর উগ্র মৌলবাদী শক্তিই … চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য দায়ী। … এও দেখা গেছে যে, নিছক তুচ্ছাতিতুচ্ছ … কেন্দ্র করেও দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছে। … হিসেবে এখানে ১৯৯৭ সালের মাইসছড়ির … সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে … উৎসবের একদিন আগে মাইসছড়ি বাজারে … পকেটমার হাতে নাতে ধরা পড়ে। তাকে … লোকজন কিছু উত্তম মধ্যম দেয়। কিন্তু … উক্ত পকেটমারটি ছিল বাঙালী, এবং … কেউ কাটার শিকার হয় সে হলো পাহাড়ী। … গণধোলাইয়ে অংশগ্রহণ করে তারা বেশীর … পাহাড়ি, যদিও কিছু বাঙালীও যোগ দেয়। … এ ঘটনাকে সাধারণ তুচ্ছ একটি ঘটনা হিসেবে … তাকে সাম্প্রদায়িক রঙ দেয়া হয় এবং … বাহিনী বাঙালীদেরকে উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা … দেয়। সেনাবাহিনী নিজেরাও পরে সরাসরি … অংশগ্রহণ করে, যার ফলে বহু পাহাড়ি … হয় এবং তাদের মালামাল লুট হয়। … বাবুছড়া বাজারেও ১৯৯৯ সালে ঠিক এই … দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। বাবুছড়ার এ … জন পাহাড়ি ও একজন বাঙালী মারা যায়। … অনেক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে … তবে কথা না বাড়িয়ে এটা পরিষ্কারভাবে বলা … যে, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর … শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে … ফিরে এসেছে বলে সরকারী মহলের হৈহল্লা … সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির কোন … হয়নি। শান্তি ফিরে আসা দূরের কথা, বরং … ওপর অত্যাচার নির্যাতন পূর্বের মতোই … রয়েছে। এক কথায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন …der box, যে কোন সময় যে কোন জায়গায় … ঘটার আশংকা সব সময় বিরাজমান।

… এই পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু, অবাধ … নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে অন্তর্বর্তী নির্দলীয় … সরকারের কাজ হবে ১. পার্বত্য চট্টগ্রামে … গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে … পিডিএফসহ সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন … ধরনের ভয়ভীতি, হুমকি ও বাধা ছাড়া তাদের … তান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে; ২. … ইউপিডিএফ-এর নেতাকর্মিসহ সকল … বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া; ৩. ভোটার তালিকা … রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত … বহিরাগতদেরকে বাদ দিয়ে নতুন ভোটার তালিকা … করা; ৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক … বজায় রাখতে যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা … করা, এবং দাঙ্গাকারী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি … কারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া; … সাধারণ নিরীহ জনগণের ওপর সেনা নির্যাতন … জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ৬. পার্বত্য … মের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে … ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এবং চিহ্নিত সন্ত্রাসী, মাস্তান ও অস্ত্রবাজদের গ্রেফতার করা; ৭. যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে গাজা, হিরোইন, ফেনসিডিলসেবী ও চোরকারবারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাথমিকভাবে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপযোগি পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। শান্তি ও স্থিতিশীলতাই হচ্ছে যে কোন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। আশা করা যায়, যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নির্দলীয় সরকার, সেহেতু দলীয় সরকারের বিপরীতে এই সরকার সংকীর্ণ পার্টিজান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হবে এবং নিরপেক্ষ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও স্টেটসম্যানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিকে দেখবেন ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিগত নিপীড়নের কিছু খন্ড চিত্র

সোনালী চাকমা

ঘটনা এক:

প্রিয় বিষয়, প্রিয় স্যারের ক্লাশ। ৯টা বেজে ৫০মিনিট। বাস ধরতে পারিনি, তাই রিক্সা চেপে ফ্যাকাল্টি যাচ্ছিলাম। বেশ ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে। ছেলেদের হলের কাছাকাছি এসেছি। রাস্তার পাশে ঝুপড়ি (ছোট ছোট চায়ের দোকান)। ওখান থেকেই আচমকা ভেসে এল-

"আতা রুটি বাটার বন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট"। (শুদ্ধ উচ্চারণ: আটা রুটি বাটারবন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট।)

গুলিতে বুক ঝাঁঝরা করে দেয়ার মত আমার মেজাজও মুহূর্তেই ঝাঁঝরা হল। আর আমি ক্ষোভে-দুঃখে মাথা ঘুরিয়ে আক্রমণকারীকে খুঁজি। ৪/৫ টা নির্বিকার মুখ দেখে বুঝার উপায় নেই কোন সে জন।

ঘটনা দুই:

আমার সতীর্থ এবং অবশ্যই বাঙালী; তাকে বলি- আমরা 'উপজাতি' নই। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সংখ্যালঘু জাতি জুম্ম; অনেকে পাহাড়ি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। 'উপজাতি' বললে আমাদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া হয়না। এতে তার তড়িৎ সরব উত্তর- 'ছোটকাল থেকে পড়ে এসেছি (জেনে এসেছি) তোমরা 'উপজাতি'। 'উপজাতি' বললে তোমাদের খাটো করার, অসম্মান করার কিছুই দেখিনা। তাছাড়া 'উপজাতি' শব্দটা স্বীকৃত বলে তোমরাও প্রতি বছর 'উপজাতি কোটা'তে দলে দলে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিচ্ছ। তাহলে এর প্রতিবাদ তুমি করো কিভাবে? আমার পাল্টা যুক্তিতে সে সায় দেয় না। আমিও ক্ষান্ত হইনা। দু'জনের অবস্থা এমন দাঁড়ায় 'সালিশ মানি, কিন্তু তালগাছ আমার'।

ঘটনা তিন:

আমাদের হলে ঢোকার নির্দিষ্ট সময় সন্ধ্যা ৭টা, শীতকালে আজানের সঙ্গে সঙ্গে। একদিন আমার এবং আমার আরেক সহপাঠির হলে ঢুকতে দেরী হয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১৫ মিনিট বেশী বাজে তখন। বাইরের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিয়ে ফিরতে যাব ঠিক তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টরের মুখোমুখি আমরা। তিনি দেরী হওয়ার অপরাধে আমাদের রাস্তার মধ্যে 'অভিভাবক সুলভ' হম্বিতম্বি শুরু করলেন এবং আরেক সহকারীর মুখ থেকে বেরুল অনুচিত, অনাকাঙ্খিত বাক্য- চাকমারাতো ঐ ধরনের (কোন ধরনের তিনি বলেন নি)। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন 'সম্মানিত' শিক্ষক।

এভাবে ঘটনা চার, ঘটনা পাঁচ করে ঘটনার হিসেব অনেক হতে পারে। অন্তত: বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রায় সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা তাই বলে। এ ঘটনাগুলো কেবল আমার বটে। তবে আমি কেবল 'আমি' নই; 'আমি' এখানে প্রতীক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ জুম্ম ছাত্র ছাত্রীদের প্রতীক। পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরো পাহাড়ী বা জুম্ম জনগণের প্রতীক।

মন্তব্য:

ঘটনা এক:

পার্বত্য অঞ্চলের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিদের মাতৃভাষা বাংলা নয়; প্রত্যেকের নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। তাছাড়া বেড়ে উঠার পরিবেশ, লেখাপড়ার পরিবেশ- এ দু'টো কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা বলায় পারদর্শী আমরা নই। যেভাবে মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার কারণে বাঙালীরা স্বচ্ছন্দে, শুদ্ধভাবে বলতে পারে। উচ্চারণ এবং স্বরের সমস্যাটা (আমাদের) তাই অনেকের কাছে (বাঙালীদের কাছে) 'হাসাহাসির' বিষয়। তবে আমি মনে করি বাঙালীদের অনুকরণে বাংলো বলতে না পারলে যেমন আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিৎ নয়, তেমনি কেউ যদি আমাদের (বাঙালী) মত করে বাংলা বলতে পারে সেটা তার বিশেষ গুণ নিশ্চয়।

ঘটনা দুই:

আমার সতীর্থের মত দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে (এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আমাদের 'উপজাতি' বলে জানে) পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিদের 'উপজাতি' বলা হয়। এবং 'তথাকথিত শান্তিচুক্তি'র মাধ্যমেও সরকার আমাদের 'উপজাতি' করে রাখার বন্দোবস্ত করেছেন। তাই এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন এক মাত্র সরকার। কেন তার এই ষড়যন্ত্র?

এই ঘৃণ্য অপবাদ, এই গ্লানিময় বোঝা ছুঁড়ে ফেলার দায়-দায়িত্ব কেবল সচেতন জুম্মদের ওপর বর্তায় না। এ জন্যও দেশের সচেতন সমাজ, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা এবং ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হতে পারে।

আসল কথা আমরা বাঙালী বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিলীন হতে চাই না। এতে সরকারের যত অপচেষ্টাই থাকুক।

ঘটনা তিন:

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে আমার কাছে একজন উৎসুক শিক্ষার্থী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ভাবমূর্তি যতটা উঁচুতে তার কয়েক গুণ উঁচুতে ছিলেন শিক্ষক/শিক্ষিকারা। এখন আমার সেই 'শিক্ষক শ্রেণী' নিয়ে সন্দেহ, বড় সন্দেহ। তাদের কাছে কী আশা করা যায়? আমাদের সম্পর্কে অনেক শিক্ষকের ধারণা বেশ হাস্যকর। আবার 'শিক্ষক মহাশয়'-এর মনগড়া কথা মেনে না নেয়ায়, উনার রুদ্ররূপ দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষরা প্রগতিশীল হয় জানতাম কিন্তু এত সীমাবদ্ধতা, এত স্পর্শকাতরতার পাশাপাশি কী প্রগতিশীলতা চলতে পারে?

প্রথমত: আপনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন কিংবা প্রবীণ হতে পারেন, আগন্তুক হিসেবে আপনাকে উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মুখোমুখি হতে হবেই। সে রাস্তাঘাটে পথ চলতে গিয়ে, শার্টল ট্রেনে চড়তে গিয়ে কতগুলো অপ্রীতিকর বাক্য আপনার মেজাজকে মুহূর্তেই ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে। অথবা ক্লাশে উপস্থিতি কম থাকলে কোন ছাত্র অথবা ছাত্রীকে শুনতে হচ্ছে- কী ব্যাপার! তোমাদের ঐখানেতো 'শান্তিচুক্তি' হয়েছে। এখন শান্তিতে থাকছ তো! থাকছ না? তাহলে এতদিন আসোনি কেন?

দ্বিতীয়ত: এই ঘটনাগুলো কারোর কাছে স্বাভাবিক এবং সাধারণ মনে হলেও আমার কাছে নিপীড়নের মত। এই নিপীড়ন মানসিক নিপীড়ন; শ্রেণীগত এবং জাতিগত নিপীড়ন।

তৃতীয়ত: আমি মনে করি, এগুলো অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অন্যায়, অনাচার জেনেও সে জাতিগত স্বার্থে (বৃহত্তর গোষ্ঠির স্বার্থে) তার অপরাপর ক্ষুদ্র জাতিকে দমিয়ে রাখার উপায় হিসেবে সে বেছে নেয় কূটচাল, আস্থা বিকল করার, আস্থা ধ্বংসে করার। তাই যখনই, যেখানে প্রতিবাদ এসেছে শুনতে হয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের 'আতঙ্কজনক ধ্বনি'।

অপরদিকে জুম্ম জাতীয়তাবাদের কথা বললে সে রীতিমত ভয় পেয়েছে, আঁতকে উঠেছে। কিন্তু কেন এই ভয়?

চতুর্থতঃ পরিশেষে স্বীকার করে নিতে হয়, এ লেখাতে কিছুটা আবেগ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ঘটনাগুলো সত্যি এবং তার প্রমাণ হিসেবে আমি নিজেকে দাখিল করছি। আমি জানিনা এতে শব্দের, বাক্যের, ভাষার অসংলগ্নতা এসেছে কিনা। যাই হোক, আশাকরি আমার লেখার মাধ্যমে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতিগত নিপীড়নের দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। □

রামগড়ে বহিরাগতদের হামলা লুটতরাজ

১ম পাতার পর

জানিয়ে লিখেছেন, মানু চৌধুরী নামে এক কলেজ ছাত্রী জানান, ঘটনার সময় পুলিশ দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখেছে। তার চেয়ে সময় পাহাড়িদের পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে মেরে ফেলুক। তার আমাদের সহ্য হচ্ছে না। এখন শুধু প্রশাসন আমাদের জন্য শোক করছে। ঘটনার সময় তারা কোথায় ছিল?

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমা ও সরকার মনোনীত আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে জনতা ক্ষোভ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। রামগড়ের ঘটনাস্থল থেকে ফিরে এসে প্রথম আলোর প্রতিনিধি লিখেছেন (২৮ জুন), ক্ষোভ, ঘৃণা আর অবিশ্বাস নিয়ে মারমা ভাষায় আবেগ করে জানালেন রামগড় সদরের মাস্টার পাড়ার গৃহবধূ সা চিং মারমা (৫৫)। তার ভিটায় ভূলন্ত কয়লা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। গত সোমবার দিন দুপুরে উত্তেজিত কিছু বাঙালি মাস্টার পাড়া আক্রমণের পর একে একে অগ্নিসংযোগ শুরু করলে অন্যান্য বাড়ির মতো সাচিং মারমার বাড়িও পুড়ে যায়। তিনি সন্তু লারমার উদ্দেশ্যে বলেন, 'এই আপনার শান্তি চুক্তির নমুনা? দেখতে এসেছেন কেমন শান্তিতে আছি? তাদের হামলা আর অগ্নিকাণ্ডের সময় না পালালে প্রাণটাও হারাতে হতো। এই যদি আপনার শান্তিচুক্তি হয়ে থাকে, সেই চুক্তি আমরা চাই না। হয় আমাদের শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ দিন, না হয় আমাদের ওপারে (ভারত) চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

মূল্যায়ন: রামগড়ের ঘটনা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে তুলেছে। এক. ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। ট্রাক চালক আকরা আলী হত্যার জের হিসেবে বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে হামলা চালিয়েছে বলে প্রচার করা হলেও তা সত্য নয়। তার নিহত হওয়ার বহু আগেই বাঙালিদের সমাবেশটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। দুই. পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী প্রশাসন নিরপেক্ষ নয়। তারা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিনিধি। সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর পাহাড়িদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না। তিন. যেহেতু প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ পাহাড়িদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, সেহেতু পাহাড়িদের নিরাপত্তার জন্য গভীরভাবে ভাবার সময় হয়েছে। প্রশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা পাহাড়িদের হাতে না দিলে তাদের নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নেই। চার. যতদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনী বহিরাগত সেটেলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকবে ততদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে না এবং পাহাড়িদেরকে সব সময় তাদের আক্রমণের ভয়ে থাকতে হবে। পাঁচ. রামগড়ের হামলা আওয়ামী লীগ সরকারের অজান্তে ঘটানো হয়েছে তা একমাত্র অকাট গণ্ডমূর্খরাই বিশ্বাস করবেন। ঘটনার সময় রামগড়ে ডিসি, এসপি'র উপস্থিত থাকা এবং হামলা প্রতিরোধে কোন রকম ভূমিকা না নেয়া প্রমাণ করে যে, ঐ হামলার সাথে প্রশাসন তথা আওয়ামী লীগ সরকারেরও মৌন সম্মতি ছিল। আওয়ামী লীগ ঘটনার সকল দায়দায়িত্ব এখন বিএনপি, জামাত ও মৌলবাদী শক্তির ওপর চাপিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে পাহাড়ি জনগণের কাছে সাধু সাজাতে তৎপর হবে। তারা আসন্ন নির্বাচনে এ ধরনের ঘটনাকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করতে পাহাড়িদের উদ্দেশ্যে এই বলে প্রচার করবে যে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে তারা পাহাড়িদের ওপর আরো অনেক বেশি অত্যাচার চালাবে। কাজেই আওয়ামী লীগকেই ভোট দিতে হবে।

তথাকথিত শান্তিচুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিতো আসেই নি। বরং নতুন করে অশান্তির বীজ বপন করা হয়েছে। রামগড়ের ঘটনা সন্তু লারমার 'শান্তিচুক্তিকে' ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। সাচিং মারমা সন্তু লারমাকে যথার্থই প্রশ্ন করেছেন 'এই কি আপনার শান্তিচুক্তির নমুনা?' এ প্রশ্ন শুধু তার নয়। এ প্রশ্ন সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের। শান্তিচুক্তির ফলে সন্তু লারমাদের কয়েকজনের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার হলেও অভাগা পাহাড়ি জনগণের ভাগ্যের ন্যূনতম পরিবর্তন হয়নি। বরং তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন আগের মতোই চলছে।

এক সময় সম্পূর্ণ পাহাড়ি অধ্যুষিত রামগড় ছিল একটি সাব ডিভিশন। এখানে বিশেষত মারমা জাতিসত্তার লোকদের বসবাস। একসময় তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর তাদের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। অতীতে বহু বার নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে তাদেরকে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। অনেক জায়গা জমি এখন বহিরাগত বাঙালিদের দখলে।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১১তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

২১-২২ মে রাজধানী ঢাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১১তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন শাখার দেড় শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ-এর প্রধান প্রসিত খীসা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রূপক চাকমা। প্রসিত খীসা বলেন, এক যুগ পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে পিসিপি একটা ছাত্র সংগঠন হিসেবে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আগামীতে নির্যাতিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার জন্য পিসিপি'কে সাংগঠনিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পিসিপি একদিকে যেমন সরকারের দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার, একইভাবে নিজেদেরকে ভবিষ্যত আন্দোলন সংগ্রামে সাচ্চা সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট। পিসিপি'র নেতা-কর্মিদেরকে অবশ্যই উন্নত চিন্তা-চেতনার অধিকারী হতে হবে। উন্নত রুচিবোধ থাকতে হবে সব নেতা-কর্মির মধ্যে। ফাঁকিবাজি করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তিনি জনসংহতি সমিতির ডিগবাজী ও নষ্টামির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন এ ধরনের নীতিভ্রষ্ট সংগঠন দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বিকেলের অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করা হয়। রিপোর্টে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিগত এক বছরের কার্যক্রম তুলে ধরা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। এতে বলা হয়, সরকারের কাছে আত্মসমর্পনের পর জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপ রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে দেউলিয়া হয় পড়েছে এবং সরকার বিরোধী বক্তব্য সত্ত্বেও সন্তু লারমা চক্র আওয়ামী লীগ সরকারের দালালে পরিণত হয়েছে। সাধারণ জনগণসহ দেশে বিদেশে বিভিন্ন মহলের সমালোচনা ও চাপ এবং ইউপিডিএফ-এর তিন দফা ঐক্য প্রস্তাব সত্ত্বেও সন্তু চক্রের সন্ত্রাসী বাহিনী আন্দোলনকারী শক্তিসমূহের ওপর সশস্ত্র হামলা অব্যাহত রেখেছে। জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপের ভূমিকা কার্যত এখন গণবিরোধী। জনগণের সামনে এদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে এদেরকে মোকাবিলা করা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যেক অধিকারকামী ও সচেতন ব্যক্তির কর্তব্য। সন্তু চক্রের প্রতি ইউপিডিএফ যে নীতি গ্রহণ করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ তা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে ও সেই লক্ষ্যে অপরাপর সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিনিধিবৃন্দ সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের ওপর প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। পরে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট অনুমোদিত হয়।

বিভিন্ন শাখা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের স্ব স্ব শাখার পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তারা সকলেই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কার্যক্রম আরো জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শেষে প্রতিনিধিদের সম্মতির ভিত্তিতে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও একটি কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী গঠিত হয়। নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে মিন্টন চাকমা ও প্রমেশ্বর চাকমা।

রামগড় দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট ইউপিডিএফ-এর ত্রাণ বিতরণ

ইউপিডিএফ ও তার নেতৃত্বাধীন সংগঠন পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ রামগড় দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ তৎপরতা চালায়। তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়িতে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে চাল, কাপড় চোপড় বইপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে। গত ১২ জুলাই তারা উত্তোলিত ত্রাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে।

উল্লেখ্য, গত ২৫শে জুন বহিরাগতরা জেলা রামগড়ের ৬টি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। এ সময় জেলা প্রশাসক ও এসপি রামগড়ে উপস্থিত থাকলেও তারা দাঙ্গা রোধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় বিশাল সমাবেশ

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ ২০শে মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠার এক যুগ পূর্তি। এ উপলক্ষে ঢাকায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ। কবুতর ও রং বেরংয়ের বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ছায়া সৈনিক আব্দুল মতিন খান, যিনি ছায়া মতিন বলে অধিক পরিচিত। বাঙালী জনগণের পক্ষে পূর্ণস্বায়ত্ব শাসনের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের যে কোন ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই। তিনি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মিদেরকে জনগণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

এরপর একটি বিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শত শত কর্মি ও শুভাকাঙ্খী এতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালীটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে দোয়েল চত্বর হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাব ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

বিকেলে "সাম্প্রদায়িকতা, নষ্টামি ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ও আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে করণীয়" শীর্ষক এক আলোচনা সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সদ্য কারামুক্ত সভাপতি রূপক চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের অন্যতম সমন্বয়ক বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান, ইউপিডিএফ-এর অনিল চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা।

আলোচনা সভা শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও বন্ধুপ্রতিম সংগঠনের শিল্পীবৃন্দ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

কল্পনা চাকমার অপহরণের ৫ বছর

ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মানব বন্ধন, আলোচনা সভা ও কল্পনা চাকমার ডায়েরী প্রকাশ

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ ১২ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণের ৫ বছর পূর্ণ হলো। ১৯৯৬ সালের এদিন রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানাধীন নিউলাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে কজই ছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীরা তাকে রাতের আঁধারে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেই থেকে তার খোঁজ মেলেনি।

ঘটনা যখন ঘটে তখন ক্ষমতায় ছিল হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। নির্বাচন শুরু হওয়ার মাত্র ৭ ঘন্টা আগে কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়। সেনাবাহিনী ঘটনাকে প্রথমদিকে "হৃদয়ঘটিত ব্যাপার" বলে অভিহিত করলেও পরে তারা তাদের সে অবস্থান থেকে সরে যায় এবং ঘটনা ধামাচাপা দেবার জন্য নানান অপতথ্য ছড়িয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। একজন সেনা কমান্ডারের কুকীর্তি ও অপরাধকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে সেনাবাহিনী তাদের পুরো প্রতিষ্ঠানকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। মানবাধিকার ও নারী সংগঠনের একাধিক তদন্ত টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তারা অপহরণের জন্য সরাসরি সেনাবাহিনীকে দায়ি করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে ঘটনার অনেক দিন পর আওয়ামী লীগ সরকার তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। কমিটি সরকারের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিলেও তা এখনো পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন কল্পনা চাকমার অপহরণ বার্ষিকীর দিন ঢাকায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। সকালে কল্পনা চাকমার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও লেঃ ফেরদৌসসহ দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এতে দেশের রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। এর আগে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ যৌথভাবে মিছিল বের করে। মিছিলটি টিএসসি সড়ক দ্বীপ থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়।

বিকেলে হিল উইমেন্স ফেডারেশন সদ্য প্রকাশিত "কল্পনা চাকমার ডায়েরী" গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনার কক্ষে এ অনুষ্ঠান হয়। কল্পনা চাকমার ডায়েরীর মোড়ক উন্মোচন করেন ৭১ এর শহীদ পরিবারের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা। এরপর কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, শিক্ষক এ এন রাশেদা, মানবাধিকার কর্মি খালেদা খাতুন, প্রিসিলা রাজ, জাতীয় গণ ফ্রন্টের আহ্বায়ক টিপু বিশ্বাস, ইউপিডিএফ-এর সচিব চাকমা ও সম্মিলিত নারী সমাজের নেত্রী সুলতানা আখতার রুবী।

বক্তারা অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানিয়ে বলেন, সরকার কোনভাবে কল্পনা চাকমার অপহরণের দায় এড়াতে পারে না। তারা অপহরক লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানেরও দাবি জানান।

সঞ্চয় চাকমাসহ চট্টগ্রামে গ্রেফতারকৃতদের জামিনে মুক্তি লাভ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ চট্টগ্রামে পুলিশ ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভা থেকে সঞ্চয় চাকমা ও অন্যতম অতিথি আলোচক করিম আবদুল্লাহসহ নয় জনকে গ্রেফতার করে এবং অনুষ্ঠানটি পণ্ড করে দেয়। গ্রেফতারকৃত অন্যান্যরা হলেন, পাহাড়ি গণ পরিষদ কেন্দ্রীয় পুনর্গঠন কমিটির সদস্য দীপায়ন খীসা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি রূপক চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিপ্লব চাকমা, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র রূপায়ন চাকমা, বিএসসি পরিক্ষার্থী নিউটন চাকমা, ইউপিডিএফ-এর সমর্থক সাধন মিত্র চাকমা ও কালাই চাকমা। করিম আবদুল্লাহ বাদে তাদের সবাইকে ইতিপূর্বে দায়েরকৃত দুইটি খুনের মামলায় জড়িত করা হয়, এবং রাঙ্গামাটি জেলে স্থানান্তর করা হয়। গ্রেফতারের কয়েকদিন পর ২২শে জানুয়ারি করিম আবদুল্লাহ ছাড়া পান।

ইউপিডিএফ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চট্টগ্রামে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ঐ আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। পুলিশ সোয়া সাড়ে চারটার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে উক্ত নয়জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ আলোচনা সভা পণ্ড করে দেয়। উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২৬ ডিসেম্বর হলেও রমজানসহ বিভিন্ন কারণে সে সময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি, তবে ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়।

ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, একটি গণতান্ত্রিক দলের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে পুলিশের হামলা সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের এই ঘটনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জেএসএস নেতা সন্তু লারমার গোপন ষড়যন্ত্রের ফল, কারণ বর্তমানে উভয়েই চরম ফ্যাসিষ্ট কায়দায় ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রসিত খীসা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় পরবর্তীতে যে কোন অঘটনের জন্য সরকারকেই দায়ি থাকতে হবে।

সর্বশেষ খবর: ১২ জানুয়ারি গ্রেফতার হওয়া ইউপিডিএফ নেতা সঞ্চয় চাকমা ও অন্যান্যরা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। গত ৩ মে চট্টগ্রামের অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক, যিনি পদাধিকার বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার জন্য সেশন জাজ, তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

প্রথম এশীয় ছবিমেলায় শুভাশীষ চাকমার আলোকচিত্র প্রদর্শনী

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এশিয়ার প্রথম আলোকচিত্র প্রদর্শনী 'ছবি মেলা'-র মাসব্যাপি অনুষ্ঠান গত ১৫ ডিসেম্বর ... অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ... আলোচিত আলোকচিত্র এতে স্থান পায়। ... নিপীড়নের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে ... জাতিসত্তাদের যে সংগ্রাম সে বিষয় নিয়ে ... শুভাশীষ চাকমার 'বাঙালী আধিপত্য' নামে ... আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২১ জানুয়ারি থেকে ... জানুয়ারি পর্যন্ত দৃক গ্যালারীতে এ ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়েছিলো। মেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তার ... ছবি পরিচিতিমূলক প্রকাশনায় বলা হয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাস একই সঙ্গে এই রাষ্ট্রে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষজনের নির্যাতন-নিপীড়নের ইতিহাস। পার্বত্যবাসী চাকমা, মারমা, ম্রুং ... অনেক জাতিসত্তার এই রাষ্ট্রে টিকে থাকার না পারার ইতিহাস তার অংশ। সশস্ত্র যুদ্ধ, গণহত্যা, সৈনিক ... সামরিক হামলা, পাহাড়ী ভিটে মাটিতে ... আগুন, যে কোন মুহূর্তে পোটলা হাতে নিয়ে ... প্রাণ বাঁচানোর জন্য সীমানা পেরিয়ে শরণার্থী ... নেয়া- এ হলো "উপজাতিদের স্বতন্ত্র কী ... প্রচারণার বাইরের বাস্তবতা। কিন্তু পার্বত্য ... ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নিধন প্রক্রিয়ার দলিল হিসেবে ছবিগুলোর গুরুত্ব অনেক।

এ ছবি মেলায় প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছে। ... আলোকচিত্র শিল্পী শুভাশীষ চাকমার প্রদর্শিত ছবি ... বেশ প্রশংসিত হয়েছে। অনেকে তার সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আগামী সেপ্টেম্বর ২০০১ ... জার্মানিতেও তার আলোকচিত্র প্রদর্শিত হবে। ... বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণ ... নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে যেয়ে যে নিপীড়ন ... নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তারই কিছু ... আলোকচিত্র থাকবে।

দৃক পিকচারস লাইব্রেরী লিমিটেড, পথিক ... আলোকচিত্র ইনস্টিটিউট পাঠশালা, আলিয়ঁস ফ্রাসেস, জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, দা বৃটিশ কাউন্সিল, আইসিসিআর এবং রয়েল নেদারল্যান্ডস এম্বেসী এই মেলার আয়োজন করে।

জেএসএস-সেনাবাহিনীর গোপন সমঝোতা!

গত ২৯ মে ২০০১ খাগড়াছড়ি জেলার হরিনাথ পাড়া ... পূর্ব দিকে অবস্থিত কালো পাহাড় থেকে জেএসএস সদস্য অনিল ত্রিপুরা (২২) অস্ত্রসহ সেনা সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে সেনারা একটি এসবিবিএল কার্তুজ বন্দুক, তাজা গুলি ও জলপাই রঙের ইউনিফরম উদ্ধার করে। ধৃত জেএসএস সদস্যটি জানায়, সে ১৫০০ টাকা বেতনে জেএসএস-এর সন্ত্রাসী কাজে জড়িত হয়েছে। ... বিভিন্ন সময়ে ইউপিডিএফ-এর সদস্যদের হত্যা করার জন্য 'এ্যাকশনে' যেতে হয়। সেনারা পরে তাকে জেএসএস নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও ... লাল চাকমার কাছে হস্তান্তর করে। এতে জনগণের মনে নানান প্রশ্ন ও সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। তাদের প্রশ্ন, তাহলে কি জেএসএস ও সেনাবাহিনীর মধ্যে গোপন সমঝোতা রয়েছে ???

সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীরা বন্দুক ভাঙায় ৬ জনকে অপহরণ করেছে

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ৮ই জুলাই রবিবার জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার বন্দুক ভাঙা থেকে ৬ ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে। এদের মধ্যে তিন জন ইউপিডিএফ কর্মি অমর মানিক চাকমার নিকটাত্মীয় এবং বাকীরা এলাকার সাধারণ নিরীহ লোকজন বলে জানা গেছে। অপহৃতরা হলেন মিহির লাল চাকমা (অমর মানিক চাকমার ভাই), রজনী মোহন চাকমা (অমর মানিক চাকমার কাকা), কান্দর সিং চাকমা (অমর মানিক চাকমার স্ত্রীর নানা), পূণ্যাধন চাকমা, চাদো রাণী ... এক জনের নাম পাওয়া যায়নি।

ইউপিডিএফ-এর ওয়েব সাইট উদ্বোধন

সম্প্রতি ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর ওয়েব সাইট উদ্বোধন করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে যে কেউ ইউপিডিএফ-এর এই ওয়েব সাইট সফর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা রয়েছে এই ওয়েব সাইটে। ইউপিডিএফ সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য এখান থেকে জানা যাবে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা